দেবারু

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রকাশক—বরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দাম দেড়টাকা
১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সময় বুঝে দুচারটে স্পষ্ট কথাও কইত। আর সেইটে বাড়িয়ে ব'লে লোকের কাছে খাতির জমাত, "তোমাদের মত মোসাহেবী করা আমার ধাতে নেই। আমার মনেও যা, মুখেও তা।" রাজাবাবুও মোটের উপর নায়েবের প্রতি তুষ্ট। কিন্তু হরিচরণের এতে তুষ্টি নেই। সে চায় ধীরে ধীরে বাবুকে মুঠোর ভেতর পুরতে। তার চিন্তার ধারা কতকটা এই রকম—

"বড়লোকের ছেলে। কলকাতার মত সৌখীন জায়গায় ছ সাত বছর কাটিয়েছে। কোথাও না কোথাও গলদ থাকতেই হবে। ও যে মদ খায় না, আমি বিশ্বাস করি না। লুকিয়ে লুকিয়ে নিশ্চয় খায়। নইলে, মোগলাই পোলাও কোপ্তার সঙ্গে শুধু জল খেলে সর্দ্দীগরমী হয়ে এতদিন মরে যেত। চালাক ছেলে কি না, ডুবে ডুবে জল খায়। গরীব দুঃখীর উপর এত দরদ, সেও একটা ফন্দী বই আর কি! মাগ্যি গণ্ডার দিন, প্রজা ব্যাটারা খুশী থাকলে আদায় পত্র সহজে হবে। কিন্তু আসল কথা, জমীদারে প্রজায় এতটা মাখামাখি থাকা কিছু নয়। ওতে আমাদের সর্ব্বনাশ। তার উপর আবার রোজ তিন চার ঘণ্টা স্বয়ং কাছারীতে বসা! এ, বাবা, মহা জুলুম।"

এই সব পাঁচ রকম ভেবে চিন্তে, হরিচরণ বৃন্দাবনে গিয়ে বুড়ো মহারাজ ও মহারাণীমার হাতে পায়ে ধ'রে তাঁদিকে দেশে নিয়ে এসেছিল। এনে, কুমারের একটী ডাগর দেখে কনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এতেও ফল হল না কিছু। যেই বাপ মা বৃন্দাবন ফিরে গেলেন, অমরেন্দ্রও বৌরাণীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

বললে, "ছেলে মানুষ, আর একটু বড় হয়ে নিজের ঘরকন্না বুঝে-নেবে। এখন পড়া-শুনো করুক।" হরিচরণ ত ব'সে পড়ল। দেওয়ানজী মহাশয়কে বললে, "মশায়, কি যে আজ-কালকার ছেলেদের বুদ্ধি! তের বছরের বৌ, তাকেও বলে কিনা ছেলে মানুষ!" মনে মনে ভাবলে, "এর মধ্যে আর কেউ আছে না কি? খবরটা ভাল ক'রে নিতে হবে।" কিন্তু নানা রকম গোয়েন্দাগিরি করেও মনিবের কোন সখীর সন্ধান পেলে না।

আর সত্যি বলতে কি, রাজাবাবুর নিত্যজীবনে রহস্য কিছুই ছিল না। সবটাই খোলা, পরিষ্কার। খুব ভোরে উঠে পালোয়ানদের সঙ্গে কসরৎ, তারপর ঘোড়ায় চড়ে অনেক বেলা অবধি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ, আবার খাওয়া-দাওয়ার পর তিন চার ঘণ্টা সেরেস্তায় বসা। এই তিন চার ঘণ্টা অবারিত দ্বার। প্রজারা এতেলা না দিয়ে একেবারে হুজুরের কামরায় চলে' যেত। মাঝে মাঝে আবার সদর ছেড়ে দূর জমীদারীতে ডেরা গেড়ে থাকতেন, প্রজাদের দুঃখ কষ্ট স্বচক্ষে দেখে আসতেন। তাঁবুতেও দৈনিক জীবন ছিল ঐ একই রকমের। আহমদ সাহেব ওস্তাদের কথা আগেই বলেছি। কলেজে লেখা-পড়া শেষ ক'রে রাজাবাবু যখন দেশভ্রমণে বের হন, তখন গোয়ালিয়র হতে এই বৃদ্ধ কলাবন্তকে সঙ্গে এনেছিলেন। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দুই এক ঘণ্টা সঙ্গীতের জলসা হত। কখন ওস্তাদজী গাইতেন রাজাবাবু সঙ্গত করতেন, কখনও রাজাবাবু গাইতেন ওস্তাদজী এসরাজ ধরতেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে দু বছরে একটা আন্তরিক বন্ধুভাব জন্মেছিল। রাজাবাবুর ভাই-ভগ্নী বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিলনা। জ্ঞাতিরা ছোট তরফের জমীদার।

তাঁদের সঙ্গে এঁদের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। কলেজেও অমরেন্দ্র বন্ধু জোটাতে পারে নেই। বড়লোকের ছেলে ব'লে মোসাহেব পদপ্রার্থী অনেক জুটেছিল। কিন্তু আমল না পেয়ে তারা আস্তে আস্তে স'রে পড়ল।

রায়নগরে রাজাবাবু খোসামুদে কাউকে কাছে ঘেঁসতে দিত না। ওস্তাদজী ফকীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কখনও সাকরেদের সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। রাজাবাবু কিন্তু নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন, আপন হয়ে সলা-পরামর্শ করতেন। একদিন এক দূর গ্রামে তাঁবুর সামনে ব'সে দুজনের আলাপ হচ্ছে। রাজাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,

"ওস্তাদজী, রায়নগরে আপনার বড় একলা একলা লাগে, না?"

আহমদ সাহেব বললেন, "না রাজাবাবু, আমি বেশ আছি। সারাদিন নিজের পড়াশুনো সঙ্গীত-চর্চ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কখন কখন দেওয়ানজীর কাছে যাই। তিনি সুফী কবিদের বায়েৎ ও ভকতদের গান শুনতে বড় ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে দুনিয়াদারী সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হয়, তর্ক বিতর্ক হয়। সময় বেশ কেটে যায়। এক এক দিন হরিচরণবাবু নায়েব গল্প করতে আসেন। তিনি জনাব মহারাজ বাহাদুরের কত পুরানো কথা বলেন।"

"হরিচরণকে কি আপনার ভাল লাগে? লোকটা বড় ধূর্ত্ত আর গভীর মতলবী। বাবাকে যেন যাদু করেছিল। এখনও বাবা ওর সব কথা বিশ্বাস করেন।"

"তা যদি হয়, ত আমাকে সাবধান হতে হবে। উনি কত কথাই জিজ্ঞাসা করেন হুজুরের সম্বন্ধে। একদিন দুঃখ করছিলেন—ওস্তাদ সাহেব, নুতন মনিব ত আর আমাকে কখনও ডাকলেন না। সংসার ত্যাগ ক'রে এইবার বৃন্দাবন চ'লে যাব।"

"কোথাও যাবে না হরিচরণ। আপনার ভয় নেই, ওস্তাদজী। আর, ওর কাছেই বা সাবধান হওয়ার কি দরকার আমাদের আছে বলুন। আমার কি এমন গূঢ় কথা আছে যে লুকিয়ে রাখতে হবে!"

"জনাব, একদিন নায়েববাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আপনি নাচ পছন্দ করেন কি না। কলকাতায় ওঁর জানা খুব সুন্দরী কসবীন আছে, উনি পূজার সময় আনাতে চান।

"না, ওস্তাদজী। আপনি ত জানেন যে আমার বাইনাচের কোন সখ নেই। তা ছাড়া, আমার জরী পেশোয়াজ পরা, চোখে সুরমা আঁকা, মুখে রঙ্গমাখা, ঐ জাতীয় স্ত্রীলোক দেখলেই রাগ হয়। কেবল ভাবি, যে পুরুষ যদি জানোয়ার না হত, ত ওরাও থাকত না এ দুনিয়াতে। আমার মতে নাচ উঠে যাক্ তাও সই, তবু যেন সমাজ এই সব কদর্য্য কৃত্রিম স্ত্রীলোকদের প্রশ্রয় না দেয়।"

"হুজুর, আপনি কেবল এক দিক দেখছেন! সঙ্গীতের মত নৃত্যও ত একটা কলা। যদি সঙ্গীতের চর্চায় দোষ না থাকে, ত নৃত্যের চর্চাতেই বা কেন থাকবে? যে গায়, বা যে নাচে, তার চরিত্রের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, জনাব? দুনিয়ার মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভকত, শ্রেষ্ঠ দরবেশ, তাঁরাও কি ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচেন নেই?"

"আচ্ছা, সাহেব। মেনে নিলাম আমি এ কথা। কিন্তু আমি ভাড়াটে নাচ-ওয়ালীর সাজ পোষাক, তাদের কৃত্রিম হাব-ভাব, কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। বড় কদর্য্য লাগে। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য একটা ভগবান-দত্ত স্বাভাবিক জিনিস। ঐ দেখুন না, বাগদীদের দুটী মেয়ে জল আনতে যাচ্ছে। কি সুন্দর ওদের গড়ন, কি সহজ ওদের অঙ্গভঙ্গী, কি সরল ওদের দৃষ্টি! ওদিকে পেশোয়াজ পরিয়ে চোখে সুরমা টেনে দিলে কি ওদের রূপ বেশী ফুটবে?"

"রাজাবাবু, এমন কথা বলবেন না। বনের ফুল সুন্দর ব'লে কি বাগানের ফুলকে কুৎসিত বলা যায়? দুই বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি!"

"ওস্তাদজী, আপনার মত উদার মন আমার নয়। যে যথার্থ গুণী লোক, সেই জগতের সব জিনিসে সৌন্দর্য্য দেখে। আসুন, সঙ্গীত চর্চ্চা করা যাক। সঙ্গীতে সব ভেদ ঘুচিয়ে দেয়।"

যথা সময় রাজাবাবু সদরে ফিরে গেলে, আহমদ সাহেব হরিচরণকে বললেন যে বাবু পূজায় বাইনাচ দেবেন না। হরিচরণ গালে হাত দিয়ে বললে,

"অবাক্ করলেন, ওস্তাদজী। জমীদারের ছেলে, এই কাঁচা বয়স, গান-বাজনার এত সখ, অথচ বাইনাচের প্রতি এমন বিরূপ! মশায়, আপনার সাকরেদের প্রাণে রস নেই।"

"তা ঠিক নয়, নায়েববাবু। প্রাণে রসের অভাব নেই। তবে কসবীনের শিনগার, তার কুটিল দৃষ্টি, রাজাবাবুর মত লোকের মন ভেজাতে পারে না। উনি দিলদরিয়া মানুষ। বাগানের চেয়ে বন ওঁর বেশী

ভাল লাগে। সেদিন বলছিলেন যে পাঁড়াগেঁয়ে কুরমী দোসাদের মেয়েরা কত খুবসুরত, যেন বনের হরিণী, তার কাছে কি লাগে সহরের সাজকরা রূপসী!"

হরিচরণ একবার ওস্তাদের মুখের পানে চেয়ে দেখলে যে তাকে বোকা বানাচ্ছে কি না। তারপর আস্তে আস্তে বললে,

"হ্যাঁ ওস্তাদজী, কথাটা ঠিক। এক একটা বাগদী দুলের মেয়ে হয় বটে ভারী চমৎকার! কালো রঙ, কিন্তু ঠিক যেন কষ্টিপাথরে কুঁদে গড়া মূর্ত্তি।" যাবার সময় আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে গেল, "বাগদী ছুঁড়ী চাই! আচ্ছা, তারই বা অভাব কি?"

অমরেন্দ্র কলকাতায় পড়বার সময় খুব ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করত। দীক্ষা সে নেয় নেই, নেওয়ার কখন ইচ্ছাও ছিল না। কেন না, পৈতা ছেঁড়ার বা মূর্ত্তি ভাঙ্গার একটা উদ্দাম উৎসাহ তার মনে কখনও আসে নেই। তবে তার নৈতিক আদর্শ, তার দরিদ্র সেবার শিক্ষা, সে ব্রাহ্মসমাজ থেকেই পেয়েছিল। আর সেই শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করবে স্থির ক'রেই সে পৈত্রিক জমীদারী হাতে নিয়েছিল। রায়নগরের আব-হাওয়া সর্ব্ব রকমে প্রতিকূল হলেও সে মোটামুটি ভোগের চেয়ে ত্যাগের পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বুঝেছিল। তবে ভাবপ্রবণ ছেলে কি না, তাই তার ত্যাগের আদর্শ শুষ্ক নীরস হতে পায় নেই। বরং দরিদ্রের সুখ দুঃখ, দরিদ্রের আশা ভরসা, তার চোখে একটা বড় সুন্দর romanceএর সৃষ্টি করেছিল।

কত সময় সে সন্ধ্যায় দখিনে হাওয়ায় ছাদে ব'সে চোখ মুদে স্বপন

দেখত, যেন সে চাষার ছেলে, সারাদিন ক্ষেতে খেটে বাড়ী ফিরে এসেছে, ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার উঠানে খেজুর পাতার চেটাই বিছিয়ে শুয়ে আছে, আর তার চাষানী পাসে ব'সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। উঠানে সিউলী গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে, চাঁদের আলোয় চকোর মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। রাজবাড়ীতে এর বাড়া আর কি সুখ পাবে!

কিন্তু এই যে স্বপনের চাষাবৌ, এ নবজলধরশ্যামা। এর সঙ্গে তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণাভা বৌরাণীর কোন সাদৃশ্যই নেই। আমাদের তের বছরের আদরিণী বৌরাণীটী ত সুদূরে বাপের বাড়ীতে বড় হচ্ছেন। এ কে!

—দুই—

রাজবাড়ী থেকে মাইল দেড়েক দূরে, গ্রামের বাহিরে, রাজাবাবুদের খামার-বাড়ী। সদর নায়েব সেইখানে থাকেন। কাছাকাছি কয়েকখানা ক্ষেত প্রজাবিলি হয় নেই, আজ একশ বছর থেকে খাসে আছে। সেই ক্ষেতগুলোতে রাজপরিবারের নিত্য সেবার নানা রকম সৌখীন সুগন্ধ ধানের চাষ হত। চিঁড়ের জন্য কামিনী, ভাতের জন্য বাদশা-ভোগ জিরেশাল হলুদগুঁড়ি, পায়সের জন্য শ্যামা, এই সবই হত। অনতিদূরে এক আমবাগান ছিল। সেখানে দেশ বিদেশ থেকে আমদানী বাছা বাছা নানা রকমের কলম লাগান হয়েছিল। রায়নগরে বসেই বাবুরা নিজের বাগানের আলফন্সো বাদশা-পসন্দ হতে আরম্ভ ক'রে পেয়ারাফুলী পর্য্যন্ত সব রকম আম খেতে পেতেন। এই ক্ষেত ও আমবাগানের তত্ত্বাবধান হরিচরণের একটা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। বুড়ো মহারাজ ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাঁর আমলে এ কাজের একটুও এদিক ওদিক হওয়ার জো ছিল না। আর, নানা প্রকার ভোগের দ্রব্যের ব্যবস্থা করেই ত হরিবাবু তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছিল। কিন্তু এই ছোকরা রাজাবাবুর ভোগের দিকে নজর কম হয়েই সব গুলিয়ে গেছে। এত বড় রাজার ছেলে, সে কি না দুপুরবেলা কেরাণীর মত কলম পেষে! খাওয়ার সখও কি বিদকুটে! মামুলী খোরাক ত শুকনো পাঁউরুটী, তার সঙ্গে কদাচ কখন পালোয়ানদের একখানা মোটা রুটী,

নয়ত ওস্তাদজীর কাবাব পরেঠা। একি বাবুলোকের যোগ্য খাওয়া! এমন জমীদারকে নিয়ে করা যায় কি? তবে ওস্তাদজী যদি সত্য কথা কয়ে থাকে ত একটা উপায় দেখছি।

হরিচরণ ঘরের দাওয়ায় ব'সে গালে হাত দিয়ে একমনে এই সব কথা ভাবছে। বারোটা বেজে গেছে, স্নানাহারের খেয়াল নেই। গিন্নী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু ঝাঁঝাল সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁগা, তোমার হয়েছে কি? অমন করে বসে রয়েছ কেন? আজ খাবে দাবে না?"

হরিচরণ হতাশভাবে উত্তর দিলে, "আর খাওয়া দাওয়া! এখানে অন্ন উঠল, গিন্নী। মনে করছি কর্ত্তার কাছে বৃন্দাবন চলে যাই পূজার পরেই।"

"বৃন্দাবন চ'লে যাবে ত এখানকার ঘরকন্নার কি হবে? বাবুদের এত সখের বাগান ক্ষেত খামার কে দেখবে?"

"সখই যদি বাবুর থাকবে, ত দুঃখ কি বল। এ ছোকরার কি ও সবের দিকে লক্ষ্য আছে? ব'সে ব'সে ছোটলোক ব্যাটাদের নাই দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছে। প্রজার মঙ্গল দেখছেন, না. আমার মুণ্ডু চড়চড়ি করছেন।"

গিন্নী মুখ ভার ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "চুলোয় যাক ক্ষেত খামার। নিজের শরীরটা ত রাখতে হবে। তুমি ওঠ, স্নান ক'রে চারটী ভাত খাও। সারা সকাল রোদে ঘুরে ঘুরে মুখে কালী প'ড়ে গেছে।"

"একটা উপায় আছে, গিন্নী। নাঃ, তোমায় এখন বলা হবে না। যদি কাজ হাসিল করতে পারি ত বলব।"

গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "দরকার কি আমার জেনে? নাই বা বললে, গো। আমি কি জমীদারের নায়েবগিরি করি না কি? বৃন্দাবন যাও ত আমার ভালই হবে। শেষ জীবনটা দেবসেবা ক'রে নিজের একটা হিল্লে লাগাব।" কুয়োতলার দিকে ফিরে ডাকলেন, "মালতী, ও মালতী, বাবুর স্নানের উদ্যোগ ক'রে দে দিকিন চট্ ক'রে।"

ডাক শুনে একটী পনের ষোল বছরের কালো মেয়ে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় দেব, মা? কুয়োতলায়, না ঘরে?"

মেয়েটীর বয়স বছর ষোল হবে। রঙ্গ নিখুঁৎ চিকন কালো, যে কালোর কাছে কাঁচা সোনাও হার মানে। পরিপূর্ণ নিটোল দেহ। কিন্তু মুখখানি একেবারে কচি, যেন দশ বছরের মেয়ে। চোখের চাহনিতে বিজলীর চমক আজও আসে নাই। হরিণীর মত চকিত দৃষ্টি। পরনে মোটা খাটো এক লালপেড়ে সাড়ী, আঁচল কোমরে জড়ান। হরিচরণের নজর সে দিকে যাওয়া মাত্র চমকে উঠল, "এই ত হাতের কাছেই অস্ত্র! আশ্চর্য্য এর কথা আগে ভাবি নেই। গিন্নী কিন্তু আমার মুখ দেখবে না এ কাজ করলে। তা হোক গে। চুলোয় যাক্। অত ন্যাকামি করলে সংসারে থাকা চলে না। ভারী ত এক দুলের মেয়ে, তার জন্যে এত দরদ!"

চেঁচিয়ে বললে, "মালতী, এদিকে আয় ত, বাছা। তোর মা কেমন আছে আজ? জ্বর ছেড়েছে?"

"ভাল নেই, বাবা। উঠতে পারে না। জ্বর লেগেই রয়েছে। কাসীটাও কমে নেই।"

"আচ্ছা, আমি ও বেলা ঔষধ দিয়ে আসব এখন। তুই ভাবিস্ না। কুয়োতলাতেই আমার চৌকী, তেল, গামছা রেখে তুই যা তোর মার কাছে।"

"মেয়েটাকে এখন থেকে তোয়াজ করতে হবে," ব'লে হরিচরণ উঠল।

একটু বলা দরকার, এই মালতী মেয়েটী কে। এর জন্ম হয়েছিল এই খামার বাড়ীতেই। বাপ মা অনেক বছর আগে দুর্ভিক্ষের সময় কোন দূর গ্রাম হতে পালিয়ে আসে। হরিচরণ তাদিকে খামারে মজুরী দিয়ে রেখেছিল। মালতীর জন্মের বছর খানেক বাদে তার বাপ মারা গেল। নায়েববাবু মা মানদাকে গোয়ালের কাজে লাগিয়ে দিলেন। সে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করত আর মেয়ে নিয়ে সেই ঘরেরই এক কোণে পড়ে থাকত। তা ছাড়া, রোজ দুবেলা দুজনে হরিচরণের বাড়ীর মোটা কাজ কর্ম্ম করে দিয়ে আসত। গিন্নী মা-বেটীকে খেতে দিতেন। মালতী দশ বছরের হলে, নায়েব বাবুর বাড়ীর কাজ সেই ক'রে দিত, আর তার মা গোয়াল নিয়ে থাকত। মেয়েটী ধীর, শান্ত, অথচ কাজে খুব চটপটে ব'লে গিন্নী তাকে বড় ভাল বাসতেন। সর্ব্বদা কাছে পিঠে রাখতেন। মানদার ও মালতীর কোন কষ্টই ছিল না। ক্রমশঃ, বয়সের সঙ্গে মালতীর রূপ যখন ফুটে উঠল, তখন রাজবাড়ীর দরোয়ান, বরকন্দাজ, সরকার, মুহুরী, সকলেরই খামারে ঘন ঘন আসার দরকার হতে লাগল। কিন্তু গিন্নী মেয়েটাকে বাঘিনীর

মত আগলে থাকতেন। তার উপর আবার হরিচরণ রাশভারী লোক বুড়ো রাজার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তার আশ্রিত মেয়ের সঙ্গে প্রকাণ্ড রসিকতা করতে এ পর্য্যন্ত কারও সাহস হয় নেই। হরিচরণেরও আজ পর্য্যন্ত খেয়াল হয় নেই যে সেই মালতী এখন বড় হয়েছে, এমন রূপসী হয়েছে। আজ যখন সে কথা মনে হল, তখন মালতীর দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে লাগল।

গিন্নী ফোঁস্ ক'রে উঠলেন, "তোমার আবার বুড়ো বয়সে ঘোড়ারোগ ধরল না কি? ছুঁড়ীটার দিকে অমন ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন? যবে থেকে মেয়েটা ডাগর হয়েছে, মিনসেগুলো এ বাড়ীর চারিদিকে মাছির মতন ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন এমন ঝাঁটা-পেটা করব যে সবাই বুঝবে।"

হরিচরণ নিজেই যেন হঠাৎ পিঠে সম্মার্জ্জনীর স্পর্শ অনুভব করলে। চমকে উঠে, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কুয়োতলার দিকে চলে গেল।

—তিন—

দু দিন বাদে মালতীর মা মরে গেল। হরিচরণের হোমিওপাথিক চিকিৎসায় কোন ফল হল না। গিন্নী মালতীকে দিয়ে শ্মশান-কৃত্য সব করালেন। মেয়েটা এমন সরল, ছেলেমানুষের মত, যে তার জন্য সকলেরই বড় দুঃখ হল।

পরদিন সকালবেলা রাজাবাবু ঘোড়ায় খামার দেখতে এসে উপস্থিত হলেন। হরিচরণ তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে মনিবের অভ্যর্থনা করলে। এ কথা সে কথার পর রাজাবাবু বললেন,

"হরিচরণ বাবু, আপনাকে যে বলেছিলাম আমার জন্য আমবাগানে একটা মেটে ঘর তুলে দিতে, তার কি করলেন?"

"আজ্ঞে, এখনও কিছু ব্যবস্থা করি নেই। হুজুর হুকুম দিলেই ক'রে ফেলব। কদিনই বা লাগবে।"

"আপনাদের এই সব আমি বুঝতে পারি না। ক'বার হুকুম দেওয়ার দরকার? হুকুম দিয়েছি ব'লেই ত আমার বিশ্বাস।"

হরিচরণ মনে মনে বললে, "ঐ রকম হট্ হট্ ক'রে কি আর জমীদারীর কাজ চলে!" কিন্তু জোড় হাত ক'রে মনিবের কাছে মাপ চাইলে, "হুজুর, বুড়ো হয়েছি সব কথা মনে থাকে না। অপরাধ নেবেন না। আমি আজই লোক লাগিয়ে দিচ্ছি কাজে।"

"হ্যাঁ মশায়, আজই লাগান লোক। আমার অত্যন্ত দরকার এ বাড়ী। পাকা দোতালা মহলে ব'সে, রাজভোগ খেয়ে, আমি আমার

প্রজাদের সুখ দুঃখের ঠিক ধারণা করতে পারি না। আমার এই মেটে ঘর চাষার বাড়ী হবে। এখানে গরীব দুঃখী অবাধে যাওয়া আসা করবে। সেপাই বরকন্দাজের দৌরাত্ম্য থাকবে না।”

নায়েব মনে মনে হাসলে, “তোমাকে বাবা, শেষ পর্য্যন্ত পাগলা গারদে না পাঠাতে হয়! এই রকম ক’রে তুমি সম্পত্তি রক্ষা করবে?”

প্রকাশ্যে বললে, “ধর্ম্মাবতার, আপনার, দয়ার অন্ত নেই। প্রজাদের যথার্থ পিতা আপনি। একটা বিষয়ে হুজুরের আদেশ প্রার্থনা করি। আমাদের গোয়াল ঘরের ঝি মানদা দুলেনী মারা গেছে। তার কাজে তার মেয়ে মালতীকে বহাল করতে চাই। বড় দুঃখী লোক ওরা। ওদের কেউ নেই।”

“এ বিষয়ে ত আমার হুকুমের প্রয়োজন নেই। খামারের কি ঝি চাকর আপনার যাকে ইচ্ছা রাখবেন। তবু নায়েববাবু, আমাকে বললেন ভালই হল। আমি জানতে পারলাম যে আপনি জমীদারী সেরেস্তার আমলা হলেও একজন হৃদয়বান্ পুরুষ। হৃদয় ব’লে একটা বালাই ত আপনাদের বড় একটা দেখতে পাই না।”

হরিচরণ মিনিট খানেক খুব বিনীত ভাবে মাথা চুলকে জোড় হাত ক’রে বললে, “হুজুর, আর একটা প্রার্থনা আছে। ঐ মেয়েটা মায়ের শ্রাদ্ধ করতে চায়, কিন্তু পয়সার অভাবে হয় ত হবে না। ওর বাপ মা খামারের পুরানো চাকর ছিল। যদি ধর্ম্মাবতার কিছু দয়া করেন।”

“তা অবশ্য করব, নায়েব বাবু। আপনি ওকে দুপুর বেলা খাজাঞ্চী বাবুর কাছে নিয়ে যাবেন। আমার মেটে ঘরটার বিষয় কিন্তু ভুলবেন না। কাজ আজই সুরু হওয়া চাই।”

রাজাবাবুর ঘোড়া খট্‌খট্ ক'রে বেরিয়ে গেল। হরিচরণ বাসায় ফিরলেন দাওয়ায় ব'সে ডাকলেন, "মালতী আছিস্?"

মালতী বাসন মাজছিল। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে দৌড়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "আমায় ডাকছিলে, বাবা? তামাক সেজে দেব?"

"না, তামাক এখন সাজতে হবে না। দুপুর বেলা নিজে সাজ গোজ ক'রে নিস্, দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাব। রাজা তোর মার শ্রাদ্ধে কিছু সাহায্য করবেন বলেছেন।"

কথা শুনে গিন্নী বেরিয়ে এলেন। "রাজা বাবুর সেই ছোট বেলা থেকেই মনটা বড় ভাল। আমি বরাবরই জানি। তোমাদের কি যে স্বভাব অমন মনিবকে মনে ধরে না।"

"হ্যাঁ গিন্নী, আমি তোমাকে বলেছি যে মনে ধরে না! একটু সাবধানে কথা বার্ত্তা কইও। কেউ শুনলে অনর্থ ঘটবে।"

"আমার দায় পড়েছে সবধান হতে! নিজেরা যখন বৈঠকখানায় ব'সে প্রজারঞ্জন, প্রজাবৎসল, ব'লে টিপ্পনী কাট, তখন মনে হয় না যে কেউ শুনতে পাবে?"

"গিন্নী, প্রজাবৎসলে ত আর আপত্তি নেই। দিকগে না একখানা তালুক বিলিয়ে ব্যাটাদের। আমরা পাঁচজন আশ্রিত তাবেদারও ত আছি, গো! বাপের মত আশ্রিতবৎসল হলেই আমরা খুশী। আচ্ছা কুছ পরোয়া নেই, একটা কিছু ক'রে নিচ্ছি এইবার।"

দুপুর বেলায় যখন হরিচরণ মালতীকে নিয়ে দপ্তরে উপস্থিত হল, তখন স্বয়ং রাজাবাবু খাজনা খানায় ব'সে। দুজনকেই ভেতরে ডাকালেন। মালতী তার মোটা সাড়ীর উপর একটা বড় চৌখুপী গামছা গায়ে দিয়ে

এসেছিল। মাথার চুল বৈষ্ণব চূড়ো ক'রে বাধা, কপালে খয়েরের টিপ। গিন্নী-মা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাবুকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মালতী দুলেনী? তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?"

"কেউ নেই, বাবু, আমার। বাপ অনেক দিন গেছে। মা ছিল, সেও গেল।" ব'লে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হরিচরণ মেয়েটীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "কাঁদিস্ না মালী। রাজাবাবুর পায়ে ধর। তোর কোন দুঃখ থাকবে না।"

মালতী এগিয়ে গিয়ে অমরেন্দ্রের দু পা জড়িয়ে ধ'রে বললে, "বাবু মশায়, আমরা ভিন্ গাঁয়ের লোক। তোমার খামারে এতকাল মজুরী ক'রে খাচ্ছি। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। না খেতে পেয়ে ম'রে যাব।"

মালতীর দু ফোঁটা চোখের জল রাজাবাবুর পায়ের উপর পড়ল। তিনি শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। গরীবের কান্না শুনলে তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়তেন। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এই সংসারে! কেন এ রকম হয়? মালতীকে দুই হাতে ধ'রে তুললেন।

"তুই কাঁদিস্ না, মালতী। নায়েব বাবু তোকে তোর মার চাকরী দেবেন। আর, তোর মার শ্রাদ্ধের জন্য এই দশ টাকা নে। হরিচরণ বাবু, একটু দেখে শুনে বেচারীর কাজটা করিয়ে দেবেন।"

মালতীর মুখে কথা সরল না। আবার বাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাহিরে বেরিয়ে গেল। বাবুরও চোখও ছল ছল করছে। মেয়েটীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হরিবাবুকে বললেন,

''মেয়েটী বড় ভাল। একেবারে অনাথা হল। নায়েব বাবু, তোমরা একটু যত্ন আত্তি কোরো।"

"হুজুরের দয়া থাকলে ওর আর কি ভাবনা?" ব'লে প্রণাম ক'রে, নায়েবও বেরিয়ে গেল।

বাবু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর খাজাঞ্চী মশায়কে বললেন, "আজ আর থাক। বড় শ্রান্ত বোধ হচ্ছে। বাকী হিসেব-পত্র কাল দেখব।"

উপরে গিয়ে অমরেন্দ্র লম্বা আরাম কেদারায় শুয়ে পড়লেন। বুকের ভেতরটা কি রকম যেন টিপ টিপ করছে। আবার মনে মনে বললেন, "এত দুঃখ, এত কষ্ট, এই সংসারে!" কত কথাই ভাবতে লাগলেন। আমি ব্রাহ্মণ, ও দুলে। আমি বড়লোক, ও গরীব মানুষ। আমি জমীদার, ও মজুর। এ ভেদ কেন? এই ভেদের জন্যই ত যত অনর্থ। আমি সব জেনে বুঝেও আমার কর্ত্তব্য করতে পারছি না। না, আর না। আমি আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেব ওদিকে। দিয়ে আমি ও ওদের একজন হয়ে যাব।

সেদিন রাত্রে রাজাবাবুর ভাল ক'রে ঘুম হল না। আবার স্বপন দেখলেন তাঁর সেই চাষার ঘর। চাঁদনী রাতে উঠানে শুয়ে আছেন মাদুর বিছিয়ে। চাষা-বৌ পাসে বসে গল্প করছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার ঘোমটা খুলে গেল। এ কি! কে এ চাষানী? এ যে মালতীর মুখ! হুড়মুড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ছি, ছি! এই তাঁর মনের কথা! অসহায়া প্রজার মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চান তিনি। স্বপনে ধরা পড়ে গেছে তাঁর যথার্থ চরিত্র!

এদিকে মালতী কাছারী থেকে ফেরবার পথে নীরব। সারা পথ চোখ মুছতে মুছতে গেল। কেন কাঁদছিল কে জানে। চাকরী বজায় রইল, মার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হল, তবু কেন কান্না! খামারে ফিরে নায়েব গিন্নীর কাছে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'সে পড়ল।

গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিলো মালী, রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হল? কিছু পেলি টেলি?"

"কি না পেয়েছি, মা? সব পেয়েছি। চাকরী রইল, মায়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হল, আবার আসবার সময় বাবাকে রাজাবাবু বলে দিলেন আমাকে যত্ন আত্তি করতে। এ ত রাজা নয়, মা। এ যে দেবতা! তোমার দয়ায় দর্শন পেলাম। তোমার পুণ্যির জোরে, মা, দেখতে পেলাম। নইলে, আমি কে?" ব'লে মালতী গিন্নীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

—চার—

পরদিন সকাল রাজাবাবু আবার খামারে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য নায়েব বাবুকে নিয়ে আমবাগানে মেটে ঘরের ভিত দেখতে যাবেন। মালতী কি জানত যে আজও রাজাবাবু আসবেন? কেন না, সে আজও গায়ে সেই রঙ্গীন গামছা জড়িয়েছে, চুল পরিপাটি ক'রে বেঁধে খোঁপায় একটী লাল টুকটুকে জবাফুল পরেছে। রাজা ঘোড়া থেকে নামেন নেই। হরিচরণের সঙ্গে কথা কইছেন, আর্ এ দিক ও দিক চাইছেন। মালতী তখন গোয়ালের ভেতর। দোয়ারের আড়াল থেকে এক দৃষ্টে কি যেন দেখছে। এত লুকোচুরী কেন এদের কে জানে! হরিচরণ হাঁক মারলে, "মালী, কোথায় গেলি? আজ বুঝি গোয়াল সাফ করতে হবে না?"

মালতী ঝাঁটা হাতে খুব ধীরি ধীরি পা ফেলে এগিয়ে এল। মাথা হেট ক'রে বললে, "এই যে বাবা, ঝাঁট দিচ্ছি।" রাজাবাবু চোখ লাল ক'রে নায়েবের মুখের দিকে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না। হরিচরণ মনে মনে মহা খুশী, সে ত এই চায়। মালতীকে বললে, "যা, মা। ঝাঁট দিয়ে নে শীগগীর। অনেক কাজ আছে। রাজাবাবুকে দেখছিস্ না? প্রণাম কর।" মালতী দৌড়ে গিয়ে রাজাবাবুর জিনের রেকাব দু হাতে ধ'রে মাথায় ঠেকালে। মুখটী একটু লাল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা অমরেন্দ্র আহমদ সাহেবের কাছ থেকে গান বাজনার ছুটী চাইলে। ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, রাজাবাবু? শরীর ভাল নেই?"

"না ওস্তাদজী, শরীর ঠিক আছে। কিন্তু মন বড় উদ্বিগ্ন। আমার আমবাগানের কুটীর দশ পনের দিনেই তৈয়ার হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কুঁড়ে ঘরে থাকলেই ত আর চাষা হওয়া যায় না। নিরিবিলি থাকতে ভাল লাগবে খুব, কিন্তু তাতে আমার কাজ কত দূর এগোবে ?"

"হুজুর-আলি, মনটাই সব। মন স্থির হলে কাজ আপনা থেকেই হবে। আপনি জন্মে আমীর হলেও আপনার দিল ফকীরী।"

"তাই ত এক সময় ভাবতাম, আহমদ সাহেব ! কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি যে ভুল করেছিলাম। কাল একটী মেয়ে, জাতে দুলেনী, দুঃখে প'ড়ে আমার কাছে এসেছিল। তার কান্না শুনে আমি খানিকক্ষণ আত্মহারা হয়ে গেলাম। মনে হতে লাগল যেন আমার সমস্ত দরিদ্র প্রজার দুঃখ কষ্ট মাথায় ক'রে এই মেয়েটী আমার কাছে এসেছে। তখনই স্থির করলাম, আর নয়, আর রাজবাড়ীতে বাস করব না, এখনই চ'লে যাব, চাষী হয়ে ওদের মাঝখানে থাকব। কিন্তু সব মিথ্যা, ওস্তাদজী, সব মিথ্যা। এখন বুঝছি আমার সত্যিকার আদর্শ ত্যাগ নয়, ভোগ—কাজ নয়, কবিত্ব। রাত্রে স্বপনে মালতীকে দেখলাম। চাষার বাড়ীর উঠানে আমার পাসে ব'সে আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। সব গেল, ওস্তাদজী। শেষ কবিত্বের দোহাই দিয়ে বাপদাদার মতন একটা যথেচ্ছাচারী লম্পটের জীবন কাটাব !"

বৃদ্ধ রাজার পিঠে হাত রেখে বললেন, "জনাব আলি আপনি অনর্থক নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। যদিই বা এই মালতীকে দেখবামাত্র আপনার প্রাণ উতলা হয়ে থাকে, যদিই বা তাকে নিয়ে আপনি আপনার হৃদয়ের

প্রেমকে সার্থক করতে চান, ত তাতে লজ্জিত হওয়ার কি আছে? আমি মুসলমান, আমার চোখে ত হুজুর, বামুন ডুলেতে ভেদ নেই। আমি সুফী, আমার চোখে জমীদারে মজুরেও ভেদ নেই। এই পার্থিব প্রেম যাকে সুফীরা ইশ্ক্ বলেন, এরই ভেতর দিয়ে সুফীর সাধনা।"

অমরেন্দ্র গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "সুফী সাহেব, মালতীকে কাছে পাওয়ার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা হয়েছে তার অত বড় নাম দেওয়া যায় না। কিছুতেই না। আমার বিদ্যার, চরিত্রের, আদর্শের, বড় দেমাক ছিল, ওস্তাদজী! তাই আজ এত অপমান বোধ হচ্ছে।"

ওস্তাদজী একটু হেসে উত্তর দিলেন, "না হুজুর, আপনি এখনও ভুল বুঝছেন। যদি আপনি হিন্দু না হতেন, ত মালতীর সঙ্গে মিলনের কোন বাধাই থাকত না। আপনার এত দুঃখ কিসের? আপনি কি কোন রকমে খোদার মরজীর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, না শুধু লোকমতকে ভয় করছেন? দুটোয় অনেক তফাৎ। এই মালতীর প্রেম হয়ত একদিন আপনাকে সত্যিই দরিদ্র প্রজার হৃদয়ের সন্ধান দেবে। এ কি হেলায় ফেলে দেওয়ার জিনিস, জনাব?"

অমরেন্দ্র দেখলেন যে এই বৃদ্ধ সুফী একেবারে ভুলে গেছে যে তিনি বিবাহিত। অথচ সেই কথাটাই তাঁকে বেশী পীড়া দিচ্ছে। তাঁর বংশে এটা ত কিছু নুতন ব্যাপার নয়! তবে তাঁর শিক্ষা, সংস্কার, অন্য রকমের। তিনি নিজেকে কিছুতেই ভোলাতে পারছিলেন না। যাই হোক, ওস্তাদজীর সঙ্গে বৌরাণীর কথা আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হল না।

সন্ধ্যাবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে গেলেন। যদি মালতী আবার
ন আসে! কিন্তু আজ স্বপনও দেখলেন ভয়ানক। পুলিস এসে
তাঁকে হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে অধীর হয়ে কাঁদছে। তিনি
তলার বারান্দার উপর একজন চম্পকবরণা, সাভরণা সুন্দরীর পাসে
। সেই দৃশ্য দেখছেন। সুন্দরীর মুখে হাসি।

আর ঘুম হল না। বসে বসে কুমার সারারাত কাটালেন। ভোর
। উস্কো খুস্কো চুল, লাল চোখ, নিয়ে ছাদে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা
তে। মাথা ঠাণ্ডা হল না।

—পাঁচ—

পাঁচটা বাজতে না বাজতে বাবু নীচে গেলেন। স্বহস্তে ঘোড়ার জিন কষে বেরিয়ে পড়লেন খামারের পথে। সেখানে পৌঁছে দেখলেন কারও সাড়া শব্দ নেই। গোয়ালের কাছ বরাবর গিয়ে ডাক দিলেন, "কে আছ, আমার ঘোড়া ধর।"

মালতী দৌড়ে বেরিয়ে এসে, ঘোড়ার মুখ ধরলে। রাজাবাবু বললেন, "মালতী, তুই এত সকাল সকাল কাজ আরম্ভ করিস্?"

"না, রাজাবাবু। এখনও কাজে লাগতে ঢের দেরী।"

"তাহলে এক কাজ কর না। আমাকে আমবাগানের পথটা দেখিয়ে দিবি আয়। আমি ঠিক রাস্তা জানি না।"

কথাটা মিথ্যা, কিন্তু মালতী বুঝলে না। দুজনে চলল আমবাগানের দিকে। অমরেন্দ্র ঘোড়ায়, মালতী হেঁটে। মালতীর একটা হাত জিনের উপর। দুজনের কি কথা হচ্ছিল? প্রেমের কথা? মোটেই না, যদিচ অমরেন্দ্রের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল মালতীকে বলবার জন্য, "আমি তোকে বড় ভালবাসি, মালতী।"

এ কথা সেই নির্জ্জন গ্রাম্যপথে, সেই ভোরের হাওয়ায়, বলবার বাধা কিছু ছিল কি? ছিল বই কি। একে রাজাবাবুর নিজের মনের দ্বন্দ্ব তখনও কাটেনেই। তার উপর মালতী এমন নিঃসঙ্কোচে হেসে হেসে ছোট্ট মেয়েটীর মতন অনর্গল গল্প ক'রে যাচ্ছিল যে তাকে বাধা দিতে রাজাবাবুর প্রাণ চাইলে না।

আধ ঘণ্টা ঘুরে ফিরে যখন দুজনে খামারে ফিরলেন, হরিচরণ জোড় হাত ক'রে, এক গাল হেসে মনিবকে স্বাগত করলেন। মালতীর কপালে কিন্তু অন্য রকমের অভ্যর্থনা ছিল। যেই উঠানে ঢুকছে, কি নায়েব-গিন্নী গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, "কোথায় গেছলি মরতে? কত বার না তোকে বারণ করেছি, না ব'লে খামারের চৌহদ্দীর বাইরে যাবি না!"

"রাজাবাবুকে আমবাগানের পথ দেখাতে গেছলাম, মা। তিনি যে ডেকে নিয়ে গেলেন!"

"তা বেশ করেছিলে। কিন্তু রাজা মহারাজার বরকন্দাজী করতে হয়, ত আমার বাড়ী ঢুকো না।"

"রাগ করছ কেন, মা? বাবু আমার জন্য এত করলেন, আর আমি তাঁর এইটুকু কথা শুনব না!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন নিজের কাজ কর্ম্ম করগে যা।" ব'লে গজগজ করতে করতে গিন্নী রান্না ঘরের পানে গেলেন।

দুপুর বেলা হরিচরণ বাড়ী আসতেই তার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, "এর ভেতর তোমার কি কোন কারসাজী আছে না কি? বুড়ো মহারাজকেও ত এই রকম করেছিলে।"

হরিচরণ ন্যাকা সেজে বললেন, "কেন কি হয়েছে? কার কথা বলছ?"

গিন্নী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ন্যাকা! ভাজা মাছটী উলটে খেতে জান না! ঐ দুলে ছুঁড়ীটাকে রোজ রোজ রাজাবাবুর সামনে নিয়ে যাচ্ছ কেন, বল ত।"

"চুপ, চুপ, গিন্নী। ও সব কথা বলোনা। কাল মালীকে কাজ উপলক্ষ করে যেই একটু ধমকাতে গেছি, মনিব অমনি ফোঁস ক'রে উঠেছেন। তা, তোরই বা এত দরদ কেন? নিজের ইষ্ট অনিষ্ট আজও বুঝলি না।"

"মুয়ে আগুন অমন ইষ্টের। ঐ টুকু কচি মেয়ে, অনাথা! হ্যাঁগা, তোমাদের কি কিছু বাধে না!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি নজর রাখব। কোন বাড়াবাড়ি হতে দেব না।" বাহিরে যেতে যেতে আপন মনে বললে, "কি চোখ, বাবা! এরই মধ্যে ধ'রে ফেলেছে। কাজ আবার পণ্ড না ক'রে দেয়! সাবধান হতে হবে।"

সন্ধ্যাবেলায় রাজাবাবু আবার খামারে এসে হাজির। কিন্তু, কি জানি কি মনে করে, ভেতরে ঢুকলেন না। সহিস পাঠিয়ে নায়েববাবুকে ডাকালেন। মালতী ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছিল। বাবু এলেন না দেখে বেচারা নিরাশ হল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দিকে চেয়ে রইল, যতক্ষণ দেখা যায়। বাড়ীর ভেতর যেতেই গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল রে, রাজাবাবুর সঙ্গে গেলি না!"

"না মা, তিনি ত কই ডাকলেন না। আমি ঘোড়ার আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে গেছলাম।"

নায়েব গিন্নী সোজা মালীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার মুণ্ডু করেছিলে। তোমার মরণ ঘনিয়ে আসছে।" মেয়েটা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

সে রাত্রি মালতী ভাল ক'রে ঘুমোতে পারলে না। ঘুরে ফিরে কেবল গিন্নীমার বকুনির কথা মনে হতে লাগল। কেন এত রাগ করছেন উনি, সে ত জেনে বুঝে কোন অপরাধ করে নেই। কি হয়েছে? বছরখানেক আগে একদিন বাসন ধুতে ধুতে সে একখানা গয়ার কালো পাথরের থালা ভেঙ্গে ফেলেছিল। নায়েববাবু ভয়ানক চটে তাকে মারতে এসেছিলেন কিন্তু গিন্নী তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ছি! ছেলেমানুষ, গরীবের মেয়ে, যদিই বা কিছু দোষ ক'রে থাকে, ওর গায়ে কি হাত তুলতে আছে?" সেই গিন্নীমা, আজ তাকে এত গালাগাল করছেন কেন? নিশ্চয় সে কিছু অপরাধ করেছে।

ভোরবেলা উঠে মালতী গোয়াল ঘর ঝাঁট দিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার মনে তখনও ঐ এক চিন্তা, "কিছু দোষ করেছি কি আমি?" বেড়াতে বেড়াতে কখন খামার বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় উঠে পড়েছে, আনমনা হয়ে। হঠাৎ পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। কত দূর এসে পড়েছে সে! এ যে আমবাগানের পথ! নিশ্চয় রাজাবাবু আসছেন ঘোড়ায়। সকালবেলা কাজের সময় এই রকম ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়ালে আর গিন্নীমা রাগ করবেন না! তিনি ত হাজার বার বারণ করেছেন খামারের বাহিরে যেতে। কিন্তু সে ভুলে যায় যে! যাক্, রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা করা হবে না। তিনি আবার টেনে নিয়ে যাবেন বাগান অবধি। এই রকম ভেবে মালতী লুকিয়ে পড়ল। রাস্তার ধারে নালার দুপাসে বঁইচি ঝোপ ছিল। তার পেছনে বসে রইল।

রাজাবাবু ঘোড়ায় চেপে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে চলে গেলেন। মনে হল যেন কি ভাবছেন। আচ্ছা, ওঁরা ত বড়লোক, কোন অভাবই নেই। তবে ভাবনা চিন্তা কিসের? একবার মালতী ভাবলে, বেরিয়ে প্রণাম করি। আবার বসে পড়ল ভয়ে, কাজ কি বাবু, মিছেমিছি গিন্নীমাকে চটিয়ে! ঘোড়া চলে যেতেই সে ছুটে খামারে ফিরে গেল। বাড়ীর ভেতর ঢুকে বাসন মাজতে বসে গেল। কেউ দেখতে পেলে না।

খানিক পরে আবার রাজাবাবুর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ তার কানে এল। তাহলে এসেছেন তিনি খামারে! মালতী কিন্তু কাজ ছেড়ে উঠল না। শুধু কান পেতে রইল, যদি তাঁর মুখের কথা দুটী শুনতে পায়।

নায়েববাবু বাড়ীর ভেতর এসে স্ত্রীকে বললেন, "ওগো, একবার মালীকে নিয়ে যাচ্ছি বাহিরে। বাবু নুতন গোয়ালের কথা কি জিজ্ঞাসা করবেন ওকে।"

গিন্নী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তুমি কি আমাকে নেকী পেয়েছ, যে যা বলবে বিশ্বাস করব! মালী যাবে না। এখনও অর্দ্ধেক পোড়া বাসন প'ড়ে রয়েছে কুয়োতলায়।"

স্বামী চুপি চুপি কি বললেন। তাতে গিন্নী আরও চটে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোমার রাজাবাবুকে বল গিয়ে যে আমি ভদ্রলোক কায়তের মেয়ে, তাঁর দূতীগিরি করতে পারব না।"

হরিচরণ মাথা হেট ক'রে বেরিয়ে গেলেন। গিন্নী মালতীর কাছে গিয়ে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে বললেন, "শোন্ পোড়ারমুখী,

তোর ইচ্ছে হয় তুই বাহিরে যা। কিন্তু ফের আসিস্ না আমার ঘরে। ছুলের মেয়ে ত, আর কত হবে!"

মালতী কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি কি করেছি, মা! আমাকে কাল থেকে এত বকছ কেন? রাজাবাবু ত আমাকে আর ডাকেন নেই। তোমার পায়ে পড়ি, গিন্নীমা, আমার উপর রাগ ক'র না।" গিন্নী আর কিছু বললেন না। রাগে গরগর করতে করতে স'রে গেলেন।

রাজাবাবু ভেতর বাড়ীর কথাবার্ত্তা সবই শুনতে পেয়েছিলেন। নায়েবকে বলে গেলেন, "আচ্ছা হরিচরণ বাবু, নূতন গোয়ালের পরামর্শ পরে হবে। আপনি মালতীকে সব জিজ্ঞাসা ক'রে রাখবেন।"

হরিবাবু স্ত্রীর উপর ভীষণ চটেছিলেন। "সব গুলিয়ে যাচ্ছে ঐ মাগীর জন্য। একবার দেখে নেব ওকে এক হাত," বলতে বলতে অন্দরে গেলেন। গিন্নীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মালতীকে হুকুম দিলেন, "দেখে আয় ত, গরুগুলো চরতে বেরিয়েছে কি না।" দিয়ে স্বামীর দিকে মুখ ফিঁরিয়ে বললেন, "দেখ, তোমার রাজাবাবুকে তার চৌদ্দপুরুষের রোগে ধরেছে। কিন্তু তাই ব'লে আমি ও গরীব ছুঁড়ীটার উপর অত্যাচার হতে দেব না। আমরাই ওকে যত্ন করে এত বড় করেছি, ওর মা ত উপলক্ষ মাত্র। এখন তুমি চাকরীর খাতিরে ওকে বেচছ! লজ্জা সরম, দয়া মায়া, তোমার কি এতটুকু নেই?"

"গিন্নী, তুমি ভুলে যাও কেন যে মালী ছোটলোকের মেয়ে! যতই লাফাও তুমি, ওকে কতদিন ঠিক রাখতে পারবে?"

"সে, ও নিজে ইচ্ছা ক'রে চুলোয় যায়, ত যাবে। কিন্তু তোমাকে এই বুড়ো বয়সে আর আমি অধর্ম্ম কুড়োতে দেব না।"

হরিচরণের এ যাত্রাও গিন্নীকে এক হাত দেখে নেওয়া হল না। চির-দিনের অভ্যাস মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে প্রস্থান করলেন।

—০—

—ছয়—

এ দিকে রাজাবাবু বাড়ী গিয়ে আহমদ সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পর বললেন, "ওস্তাদজী, আজই কয়েক দিনের জন্য মফস্বল যাব। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।"

"আমি মুসাফের মানুষ, সর্ব্বদাই সফরের জন্য প্রস্তুত আছি, জনাব। কিন্তু আপনার হঠাৎ এ ইচ্ছা হল কেন? তবিয়ৎ ভাল নেই? চেহারা বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।"

"ওস্তাদজী, সে দিন মালতী ফুলেনীর কথা বলেছিলাম, মনে আছে?"

"আছে বই কি, হুজুর। তা কি হয়েছে? মন স্থির করতে পারছেন না, তাই মনে অশান্তি হয়েছে?"

"না, ঠিক তা নয়, ওস্তাদজী। আমাকে অন্য লোকে বাধা দিচ্ছে। আজ অনেক চেষ্টা করেও তাকে একবার দেখতে পেলাম না।"

"আপনাকে বাধা দিচ্ছে, জনাব? আপনার নিজের রাজ্যে? কে এমন শক্তিমান আছে? মিলনের পথে যে বাধা আছে, তা চূর্ণ ক'রে দিন, রাজা সাহেব, সেই ত মরদের কাজ। অনর্থক মনঃকষ্ট কেন ভোগ করছেন?"

"সে শক্তি আমার নেই, সাহেব। এ বাধা ধর্ম্মের বেশে এসেছে। তাকে আমি হঠাব কেমন করে! চলুন, তার চেয়ে পালাই। যদি ভুলতে পারি।"

"আপনার যেমন মরজী, হুজুর! কিন্তু যথার্থ প্রেম কখনও বাধা বিপত্তি মানে না।"

পরদিন ভোর বেলায় রাজাবাবু সফরে বেরিয়ে গিয়ে তিরিশ মাইল দূরে এক গ্রামে ডেরা গাড়লেন। প্রতিজ্ঞা ক'রে বের হলেন যে মালতীর ছবি মন থেকে ছিঁড়ে ফেলে তবে ফিরবেন: এই খানেই বলে রাখি যে তাঁর সদুদ্দেশ্য সফল হল না। চতুর্থ দিন ভোর চারটের সময় উঠে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, আর সোজা রায়নগরের খামার-বাড়ীতে সাতটার সময় গিয়ে নামলেন।

মালতীর কথা বলি। গিন্নীর কাছে বকুনি খেয়ে সে সারা দুপুর বসে ভাবতে লাগল, তার চারিদিকে হচ্ছে কি? বুকের ভেতর ক্রমাগত দুড় দুড় করছিল, কিন্তু তবু বেচারা বুঝতে পারছিল না, তার হয়েছে কি। মনটাই বা তার কেমন কেমন করছে কেন? গিন্নীমাই বা তাকে মুখ করছেন কেন? নায়েব বাবুই বা অমন চেহারা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? সন্ধ্যাবেলা শুনলে, রাজাবাবু এক মাসের জন্য মফস্বল চলে গেছেন। নায়েব বাবু নিজেই বললেন তাকে।

"মালী, তোর আস্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখছি। সকাল বেলা ডাকতে গেলাম বাহিরে এলি না যে! রাজাবাবু তোকে কি কাজের কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, তা হল না।"

"তা, বাবা, আমার কি দোষ? গিন্নীমা রাগ করেন যে, আমি বাহিরে বেশী গেলে। তুমিও ত তখন আর কিছু বললে না!"

"বেশ! তোর গিন্নীমাকেই নিয়ে থাক্। রাজাবাবুকে রায়নগর থেকে তাড়িয়ে ছাড়লি ত!"

"আমি তাড়ালাম, বাবা! তিনি ত কাজের জন্য প্রায়ই জমীদারীতে বেরিয়ে যান।"

"এবার সে রকম যাওয়া নয়, রে! এক মাস ফিরবেন না বলেছেন। তাও ফিরলে হয়!"

"হ্যাঁ বাবা, বাবু আমার উপর রাগ করেছেন?"

"তোকে নিয়ে আমি পারব না। তুই কি এতই বোকা, না আমার সঙ্গে ন্যাকামি করছিস?" ব'লে হরিচরণ চলে গেল।

সেই দিন গভীর রাত্রে বিছানায় পড়ে পড়ে মালতী চকিতের মত বুঝতে পারলে। বুঝতে পারবা মাত্র ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,

"এক মাস আসবে না আমার রাজা? সারা মাস একবার দেখতে পাব না? কেমন ক'রে বেঁচে থাকব?"

রাত ভোর কাঁদলে। কিন্তু কি মিষ্টি সে কান্না! কেঁদে এত সুখ? কই, কখন্ ত সে জানত না!

পরদিন ভোর বেলা যখন মালতী গোয়ালের বাহিরে এল, তখন সে নেশায় ও শ্রান্তিতে টলছে। সুখে দুঃখে তার বুকের ভেতরটা এমন

ভরে রয়েছে! ইচ্ছা করছে যে চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, শুয়ে শুয়ে প্রাণ ভ'রে বুকের বেদনাটা উপভোগ করে। ক'বারই বা সে রাজাবাবুকে দেখেছে, ক'টা কথাই বা তাঁর মুখের শুনেছে! যা সামান্য পুঁজি ছিল, তাই মনের ভেতর বন্ধ ক'রে রেখে কাজ কর্ম্ম করতে লাগল। তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে আবার ঘরে এসে শোবে, বুকের কপাট খুলে চুপি চুপি দেখবে। দেখবে আর কাঁদবে, সাধ মিটিয়ে কাঁদবে। নায়েব বাবুর বাড়ী যেতেই গিন্নী বললেন, "ও কি রে, তোর জ্বর এল না কি? চোখ অমন লাল হয়েছে কেন? বস্, বস্, চুপ ক'রে বস্। ওগো, একবার এ দিকে এস ত, মালীর কপালে হাত দিয়ে দেখ ত, জ্বর-টর এসেছে কি না।"

হরিচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালতীকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। মুস্কিল করলে! অসুখ বিসুখ করলে মনিব তাকে আস্ত রাখবেন না। একবার কপালে হাত দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ গো, খুব জ্বর। ও স্থির হয়ে শুয়ে থাক্ একটু, আমি ঔষধ দিচ্ছি।"

গিন্নী বললেন, "তা, যা যা। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি একটু সাগু ক'রে দিয়ে আসব এখন।"

গোয়াল ঘরে পৌঁছে মালতী হরিচরণকে বললে, "বাবা, আমার ত জ্বর-টর হয় নেই। কিন্তু সারা রাত ঘুমোতে পারি নেই, কেবল স্বপন দেখেছি। একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।"

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, রাজাবাবু কতদিনে আসবেন?"

হরিচরণ হেসে উত্তর দিলে, "ডেকে পাঠাব রে?"

মালতী লাফিয়ে উঠে তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠল, "না, বাবা, না। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, তাঁকে ডেকো না।" ব'লে এমনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল যে চির-পাষণ্ড নায়েব বাবুরও চোখে জল এল।

"তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ মা।" ব'লে চোখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

গোয়ালের বাহিরে একবার দাঁড়িয়ে ভাবলে, "তাই ত! আমি কি কিছু সত্যি পাপ করছি না কি! মনটা এমন করছে কেন?" আবার সামলে নিলে। "না না, পাপ কিসের? আমি কিছু না করলেই কি আর চিরদিন ঐ ছোট লোকের মেয়ে ঠিক থাকবে! মাঝের থেকে শুধু আমারই কাজটা পণ্ড হবে।"

ঘরে শুয়ে শুয়ে মালতীর অধীরতা প্রতি ঘণ্টায় বেড়ে যেতে লাগল। সে যে কত রকমের আহাম্মকী করেছে তার গুনতি নেই! সেদিন আমবাগানের পথে কেন সে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল? তার পর গিন্নীমার কথা অগ্রাহ্য ক'রে বাহিরে রাজাবাবুর কাছে কেন গেল না? তা হলেই ত আরও বার দুই দেখা হত, তার সম্বল বেড়ে যেত। আচ্ছা, নায়েব বাবু যে বললেন, "রাজাবাবুকে রায়নগর থেকে তাড়িয়ে ছাড়লি," তার মানে কি? সে কি ক'রে তাড়ালে? নায়েব বাবু কি সব যা তা বলেন! রাজাবাবুকে ডেকে পাঠাবেন! ছি! ডাকলেই বা তিনি আসবেন কেন? আমাদের জন্য ত তাঁর ঘুম হচ্ছে না!

দ্বিতীয় দিন থেকে মালতী কতকটা সামলে নিলে। অর্থাৎ বাহিরে একটা শান্ত ভাব আনতে পারলে। ভেতরে কিন্তু সেই ঝড় তুফান! তা হলই বা ঝড়, এ ঝড় তার বেশ ভাল লাগছে।

ফেরে নেই। সন্ধ্যার সময় ছাদে ব'সে হরিচরণকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে জোড় হাত ক'রে অনুযোগের সুরে বললে, "হুজুর ভোরবেলা খামারে গেলেন, একবার অধীনকে দেখা দিলেন না। আওয়াজ পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বের হয়ে এলাম, ততক্ষণে হুজুর ফিরে আসছেন।"

"মালতী সেখানে ছিল?"

"হ্যাঁ ধর্ম্মাবতার, সে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই। আমাকে দেখে মহা আনন্দে বললে—আমাদের রাজাবাবু ফিরে এসেছেন বাবা, কই তিনি ত আমার উপর রাগ করেন নেই। আমি তাকে বললাম—ওরে, তিনি কারও উপর রাগ করেন না।"

অমরেন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "হরিবাবু, আমি ভাবছিলাম যে মালতীকে রাজবাড়ীতেই নীচেতলায় একটা কিছু কাজ দিলে হয়। তুমি খামারে অন্য একজন লোক দেখে রেখে নিও।"

"তা ত সহজেই হতে পারে, হুজুর। আমি ভাঁড়ারী ঠাকরুণকে ব'লে যাই। কবে থেকে এখানে বহাল করে দেব?"

"আজই খাওয়া দাওয়ার পর এখানে পাঠিয়ে দিও।"

হরিচরণ মাথা নত ক'রে জানালে যে সে নিজেই সঙ্গে ক'রে এনে দিয়ে যাবে। আর তাকে পায় কে! কাজ ত হাসিল করেছে.

এক প্রহর রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে মালতী গোয়ালঘরে আগড় দিয়ে শুয়েছে। তার মনটা আজ খুব হালকা। সে তার দেবতার দেখা পেয়েছে। দেবতা তার উপর প্রসন্ন। আর তার চাই কি! ঘুমোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে

বাহিরে। একটু পরেই নায়েব বাবু চাপা গলায় ডাকলেন, "মালতী, ঘুমিয়েছিস্ কি ?"

"কেন, বাবা ?" ব'লে উঠে সে দোর খুলে দিলে।

হরিচরণের মাথায় চাদর জড়ান। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লণ্ঠন। সে খুব ব্যস্তভাবে বললে, "মালী, আমার সঙ্গে চলে আয়, রাজবাড়ীতে যেতে হবে।"

"রাজবাড়ীতে, এত রাত্রে, কেন বাবা ?"

"বাবু তোকে ডেকেছেন।"

মালতীর বুকের ভেতর যেন কে হাতুড়ী মারতে লাগল। সে ব'সে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, "রাজাবাবু আমাকে এত রাত্রে যেতে বলেছেন! তুমি ঠিক বলছ, বাবা ?"

"হ্যাঁরে, ঠিক বলছি। মিথ্যা কথা কেন বলব ? শীগগীর নে, আর বসিয়ে রাখিস্ না রাজাবাবুকে।"

মালতী উঠে দাঁড়াল। খুব দৃঢ়স্বরে বললে, "থাকুন ব'সে তোমার রাজা। আমি যাব না, নায়েব বাবু। তাঁকে বলগে, মালতী দুলেনী আসবে না রাজবাড়ীতে।" ব'লে এক ছুটে পালিয়ে গেল গিন্নীমার কাছে ভেতর বাড়ীতে।

হরিচরণের খুব রাগ হল প্রথমটা। কিন্তু তার পর ভাবলে, "এতে বোধ হয় ভালই হবে। বাধা পেলে রাজার ঝোঁক আরও বেড়ে যাবে। তা'তে আমার সুবিধা বই অসুবিধা নেই।"

একবার ভেতরে উকী মেরে দেখলে যে আটচালার এক কোণে মালতী শুয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করতে গেলেই গিন্নীর ঘুম ভেঙ্গে

যাবে। তাহলেই তার কর্ম্ম সারা! কি করে, রাজাবাবুকে খবরটা দিতে হবে ত! গেল রাজবাড়ীতে। বাবু সেই বসে আছেন ছাদে আরাম কেদারায়। হরিচরণের আওয়াজ পেয়ে উঠে এগিয়ে এলেন। "এনেছ তাকে, নায়েব বাবু?"

"হুজুর সে কিছুতেই এল না।"

"এল না! আমি মারধর রাগারাগি করি না ব'লে তোমরা ভাব, যে যা খুশী তাই করতে পার! কি রকমের নায়েব তুমি? যাও, এক্ষণই ধ'রে নিয়ে এস।"

হরিচরণ মনে মনে ভক্তি ভরে একবার বললে, "জয় জগদম্বা!" তার পর জোড় হাত করে রাজাবাবুকে "যে আজ্ঞা", ব'লে সিঁড়ির দিকে এগোল। যখন আধখানা সিঁড়ি নেমেছে রাজাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "না, ধরে আনবার দরকার নেই আজ। আপনি ঘুমোন গিয়ে।"

হরিচরণ চলে গেল। অমরেন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তার পর উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে একজন দরওয়ান ডাকালেন। এলে হুকুম দিলেন, "লণ্ঠন নিয়ে যাও। আহমদ সাহেব ফিরে এসে থাকেন, ত তাঁকে নিয়ে এস।"

কয়েক মিনিটেই আহমদ সাহেব এসে হাজির হ[illegible]। বাবুকে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেসা করলেন, "হুজুরের কি তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে? এখনও শুতে যান নেই! আমাকে তলব করেছেন কেন, জনাব?"

"ওস্তাদজী, আমায় কেন আসতে দিলেন মফস্বল থেকে?" স্বরটা

ছেলে মানুষের মত শোনাল। আসলে, রাজাবাবু সেখান থেকে কাউকেই ব'লে আসেন নেই।

তবু আহমদ সাহেব বললেন, "তাতে দোষ কি হয়েছে, হুজুর? সেও আপনার রাজ্য, এও আপনার রাজ্য।"

"না, ওস্তাদজী, ঠিক তা নয়। যেখানে আমার হুকুম অমান্য করলেও চলে, সেখানে থাকলে আমার ইজ্জতের হানি হয়।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না, রাজা সাহেব, মেহেরবানি করে বলুন কি হয়েছে।"

"কি আর বলব ওস্তাদজী? একটা সামান্য দুলেনী, একজন অতি ক্ষুদ্র মজুরনী, আমাকে আজ অপমান করেছে। মালতীর কথা শুনেছেন ত? তাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে জবাব দিয়েছে, বল গিয়ে রাজাকে যে মালতী দুলেনী তাঁর বাড়ী যাবে না।"

"হুজুর আলি, সে ত সামান্য দুলেনী নয়। আমি শুনেছি যে আজ সকালে রাজা সাহেব রাজধানীতে ফিরে এসে, সব প্রথম তার দরবারে সেলাম করতে গেছলেন।"

"সত্য কথা, আহমদ সাহেব। সত্যই গেছলাম। শুধু তাই নয়। তাকে দেখবার জন্যই তিরিশ মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলাম। এখন বুঝেছি, ভুল করেছিলাম। নাই দিলে কুকুর মাথায় চড়ে।"

"কাকে কুকুর বলছেন, জনাব? যার জন্যে পালঙ্ক সাজিয়ে বসেছিলেন, যে এল না ব'লে আজ দুনিয়া অন্ধকার দেখছেন, তাকে! না, রাজা সাহেব, না। একশোবার না।"

"একবার হুকুম দিলাম ধরে আনতে, তারপর আবার মানা করে দিলাম। আপনি বলুন আহমদ সাহেব, ঠিক কাজ করেছি?"

"অবশ্য ঠিক কাজ করেছেন, জনাব। কাকে ধরে আনতেন? সে ত একটা দেহমাত্র। যে হৃদয় আপনার মত লোককেও যাদু করেছে, সে ত তার অনেক আগেই চুরমার হয়ে যেত। যে মালতীর কাছে আপনি প্রজার হৃদয়ের সন্ধান চেয়েছিলেন, সে মালতীর উপর ত জোর চলবে না, হুজুর। সে কুকুরও নয়, সামান্য দুলেনীও নয়।"

অমরেন্দ্র মাথা হেট ক'রে বৃদ্ধ বন্ধুর তিরস্কার শুনছিলেন। বললেন, "ওস্তাদজী, আমি মালতীকে চাই। তার সমস্তটাই চাই। শুধু তার দেহ নিয়ে কি করব? তাই ত তাকে ধ'রে আনালাম না। কিন্তু এখন উপায়?"

"হুজুর, কাল সকাল একবার এই মালতী বিবিকে দেখে আসব, সেলাম করে আসব, তার পর বলতে পারব, কি উপায়। এ জিনিস পথে ঘাটে পাওয়া যায় না, জনাব আলি!"

—আট—

সকালবেলা মালতী বাসন মাজছে বাড়ীর ভেতর, এমন সময় হরিচরণ এসে বললে, "গিন্নী, রাজবাড়ী থেকে ওস্তাদজী এসেছেন। তাঁর জন্য একবাটী দুধ পাঠিয়ে দাও মালীর হাতে দিয়ে।"

একটু পরে মালতী দুধ নিয়ে উপস্থিত হল বৈঠকখানায়। আহমদ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে, সেলাম ক'রে, তার হাত থেকে দুধ নিলেন। দুধ খেতে খেতে হেসে বললেন, "মাই, তোর আমি কাকা হই। মনে রাখিস্, আজ থেকে যখন তোর দুঃখ কষ্ট হবে আমাকে জানাবি।"

মালতী কিছু বললে না। হেট হয়ে নমস্কার করে দুধের বাটি নিয়ে চলে গেল। তার মনে কাল রাত্রে যে দাগা লেগেছে, আজও তার যন্ত্রণা কমে নেই। গিন্নীকে সে কিছুই বলে নেই। হরিচরণ একবার কথা কইতে এসেছিল, কিন্তু তার পাংশু চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। এখন সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে একটা গল্প বানিয়ে ওস্তাদজীকে ব'লে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন উপায়, ওস্তাদজী?"

তিনি হেসে বললেন, "উপায় আর কি? তোমরা হেরে গেলে। মালতীকে নিয়ে বেশী টানাটানি করতে যেও না। কোন্ দিন চ'লে যাবে, শুধু লাশটা পড়ে থাকবে। সেটা নিয়ে রাজারও প্রেম করা হবে না, তোমারও কার্য্যসিদ্ধি হবে না।"

হরিচরণ কাষ্ঠহাসি হাসলে, "কি যে বলেন, সাহেব, ঠিক নেই। আমার আবার কার্য্যসিদ্ধি কি? আমার একমাত্র কার্য্য মনিবের তুষ্টিসাধন।"

"নায়েব বাবু, আমার উপর বিরক্ত হবেন না। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে সর্ব্বদা আপনার বিবিসাহেবের পরামর্শ মত কাজ করবেন।"

"ওস্তাদজী, গিন্নীর কাছে এ সব কথা বলতে গিয়ে কে কাঁচা মাথাটা দেবে, বলুন! তার চেয়ে আপনি মেহেরবানি রাখবেন, আর মাঝে মাঝে দুটো ভাল উপদেশ দিয়ে যাবেন।"

সন্ধ্যাবেলা আহমদ সাহেব রাজবাড়ী গিয়ে ছাত্রকে বললেন, "মালতী ফুল দেখে এলাম, হুজুর। বড় নাজুক। ও ফুল গাছ থেকে তুলতে তুলতে শুকিয়ে যাওয়ার ভয় আছে।"

রাজাবাবু বললেন, "তবে উপায়? আমি কি গাছের কাছে গিয়ে রোজ ফুলকে গান গেয়ে শুনিয়ে আসব? এই আপনার রায়?"

"হুজুর, সুফী চূড়ামণি হাফেজের এক গল্প বলি। তার থেকে আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।

একদিন এক বুলবুল গোলাপের ডালে ব'সে মধুরস্বরে গান গাইছিল। এক পতঙ্গ সেখান দিয়ে উড়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলে, 'বুলবুল, এখানে করছ কি?' পাখী অবজ্ঞাভরে উত্তর দিলে, 'পিয়ারীকে গান গেয়ে শোনাচ্ছি। তুই তার মর্ম্ম কি বুঝবি?' পতঙ্গ হেসে উঠল, 'তুই তাহলে মস্ত বড় প্রেমিক! পিয়ারীকে সুর করে গান গেয়ে প্রেম নিবেদন করছিস। মূর্খ, কিন্তু তাতে সুখ কি? প্রেম কাকে বলে শিখবি আমার কাছে? আমার পিয়ারী দীপশিখা। আমি তার কাছে গান গাই না। তার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র জীবন শেষ করে দিই। ভেদ চিরদিনের মত ঘুচে যায়।'

হুজুর, আশক (প্রেমিক) বুলবুলের মত গানও গায়, পতঙ্গের মত

আগুনে ঝাঁপও দেয়, কিন্তু জবরদস্তী ক'রে প্রেম নিবেদন কবি কল্পনার বাহিরে।"

"তাই ভাল, ওস্তাদজী। বুলবুলের ধর্ম্ম শিখব। না কিছু হয়, পতঙ্গের আহুতি ত আছেই। কাল সকালই যাব আমার মালতী ফুলের কাছে গান গাইতে।"

ভোরে উঠে গেলেন রাজাবাবু খামারে। মনে লজ্জা সঙ্কোচ যথেষ্ট ছিল তবু প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা হতেই হেসে বললেন, "মালতী, তুই কি কাল মনে করেছিলি যে আমি এতই হীন নগণ্য লোক, যে নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারি না?"

"তা কেন মনে করব, রাজাবাবু? আমি কি জানি না যে তুমি রাজা, তোমার ক্ষমতার অন্ত নেই? তবে আমি ভাবতাম, যে তুমি প্রজার দুঃখে দুঃখী, তাদের কষ্ট ঘোচাবার জন্য সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

"সে বিশ্বাস কি তোর চ'লে গেছে, মালতী?"

"না, রাজা বাবু, যায় নেই। কাল অন্ধকার অমাবস্যার রাতে তোমাকে ভূতে পেয়েছিল। আজ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যে ভূতটা নেমে গেছে।"

"মালতী, তোকে বলতে এলাম যে দিন কয়েকের জন্য আবার মফস্বল যাচ্ছি। একেবারে ভূত ছাড়িয়ে ফিরব।"

"এসো, রাজাবাবু।" ব'লে মালতী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলে।

অমরেন্দ্র সাত দিন হল তাঁবুতে এসেছেন। ভূত ঝাড়াতে বাহিরে আসা কি না, তাই কাজের মাত্রা খুব বাড়িয়ে দিয়েছেন। সারাদিনই একটা না একটা কিছু নিয়ে লেগে আছেন। ভূতকে খোরাক দেবেন

না, উপোসী মারবেন, এই মতলব। খুব ভোরে উঠে ঘোড়ার উপর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ান। কোথায় কুয়ো চাই, কোথায় রাস্তা, কোথায় ইস্কুল, এই সব তদ্বির করেন। ডেরায় ফিরতে রোজ বারোটা বেজে যায়। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে, আবার দপ্তরের কাজ নিয়ে বসেন। পাঁচটার সময় একটু বেড়াতে বের হন, মাঠে মাঠে, নদীর ধারে। ততক্ষণ গাছতলায় গালিচার উপর তাম্বুরা, বাঁয়া তবলা, তৈয়ের। ফিরে এসে ঘণ্টা দুই আহমদ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা করেন। তবে আজ কাল বাঙ্গলা গান, কি গজল টপ্পা একেবারে নিষিদ্ধ। কেবল ধ্রুপদ আর ধ্রুপদ। ওস্তাদজী একদিন দাদরা তালে এক ঠুংরী ধরেছিলেন ব'লে রাজাবাবু ভয়ানক খেপে গেছলেন, "ওস্তাদজী, ও সব হালকা জিনিস এখন কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে। আমার মোটে বরদাস্ত হয় না।"

ওস্তাদজী ত আজকের মানুষ নয়। বুঝতে পারতেন সবই। তবে তিনি আপনি হয়ে রায়নগরের কথা কেন পাড়বেন!

খাওয়া দাওয়ার পর, রাজাবাবুকে একলা পেয়ে কিন্তু ভূত রোজ এসে চাপে মাথার উপর। হাতের কাছে কোন ওঝা নেই, তাই ভূতেরও কোন ভয় নেই। তখন কি খেলাই খেলায় বেচারা অমরেন্দ্রকে নিয়ে। তা খেলাটা নিতান্ত মন্দ লাগে না তার। ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, সুন্দর অসুন্দর, কত কথাই বেচারার মনের মধ্যে ছুটোছুটী করে। খেলায় জিত কিন্তু রোজ ভূতেরই হয়। রাজাবাবুর মাথার ভেতর যে সব ভাবনা আসে তা মোটামুটি এই রকম,

"ছেলেবেলা থেকে স্থির করেছিলাম যে জীবনটা কর্ত্তব্যের ভিত্তির উপর গড়ে তুলব। জমীদারের ঘরে জন্মেও চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখব।

প্রজার অভাব মোচন করব, তাদের কষ্ট লাঘব করব। তাদের মাঝে সর্ব্বদা ঘুরে ফিরে তাদের দুঃখে দুঃখী হতে শিখব। যদি শক্তিতে কুলায়, ত একদিন সর্ব্বস্ব প্রজাদের ধ'রে দিয়ে নিজেও তাদের একজন হয়ে যাব। এই আদর্শ ধ'রে বেশ এগিয়ে চলেছিলাম। এমন সময় এল বৌরাণী। ছেলে মানুষ, কিন্তু কি অসম্ভব দেমাক তার। অসামান্যা রূপসী, কিন্তু সে রূপে চোক ঝলসে যেত। তাতে স্নিগ্ধতা কিছুই দেখতে পেলাম না। সে আমায় পথভ্রষ্ট করতে পারলে না। নিজের কাজ নিয়েই রইলাম। তার পর মাঝে এসে পড়ল মালতী। রূপে সে বৌরাণীর কাছেও লাগে না, কিন্তু সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল যেন আমার সমস্ত গরীব প্রজার মূর্ত্তিমান প্রতীক। তার চোখে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ জ্যোতি, মুখে ফুল্ল কমলের কোমলতা। আমার মনের বীণার সমস্ত তার গুলোয় এক সঙ্গে ঘা পড়ল। কিন্তু কবিত্ব রইল কই! পশুর আবার কবিত্ব! স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হয়েছি, অসহায়া প্রজার মেয়ের উপর জবরদস্তী করতে গেছি। পেলাম না কিছুই। কেবল পাঁচ জনের শ্রদ্ধা হারালাম। আমার নির্ম্মল চরিত্র, উচ্চ আদর্শের কথা ভেবে বাপ দাদার সঙ্গে নিজের তুলনা করতাম আর কত আনন্দই পেতাম, কত গর্ব্ব বোধ করতাম। আর গর্ব্বের কি রইল! বৌরাণীর মুখ এখন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রায় মনে নেই। এতে কি আমার পাপ হচ্ছে? তা হোক গে। মালতীকে যদি পাই, ত আর সব চুলোয় যাক। আপত্তি নেই। কিন্তু তাকেই বা পাব কি ক'রে?"

এই চিন্তার ধারার ভেতর ন্যায় বা যুক্তি কিছু আছে কি? থাকবে কোথা হ'তে, ভৌতিক কাজে কি যুক্তি থাকে কোন দিন?

আট দিনের পর এক পত্র এল হরিচরণের কাছ থেকে। আমবাগানের মেটে ঘর তৈরী হয়ে গেছে। হুজুর একবার এসে দেখবেন না? একবার দেখে হুকুম দিলে আসবাব পত্রের ব্যবস্থা সে করতে পারে। যে রকম গরম প'ড়ে আসছে, আর তাঁবুতে থাকা হুজুরের পক্ষে ঠিক হবে না। কিছুদিন আমবাগানে কাটালে এ সময় বড় ভাল লাগবে। সব গাছে মুকুল ধরেছে। গন্ধে চারিদিক আমোদিত। সন্ধ্যাবেলায় এমন সুন্দর দখিনে হাওয়া ছোটে, যে পাঁচ মিনিটে দিনের শ্রান্তি চ'লে যায়। কাছাকাছি অনেকগুলো গ্রাম আছে। হুজুর সেগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন। তার ছুটোতে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার চলছে, ইত্যাদি। শেষ কালে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, মালতী ভাল আছে।

চিঠিখানা রাজাবাবু ওস্তাদজীকে প'ড়ে শোনালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "জনাব, কি করবেন ঠিক করলেন?"

"আপনারা এখানে থাকুন। আমি কাল ভোরেই একবার যাই। বাড়ীটা দেখে পরশু ফিরব।"

"সেই ভাল, হুজুর। একটা কথা আছে। তাবেদারের গোস্তাগী মাপ করবেন। মালতী বিবির সঙ্গে দেখা হয়, ত তার চাচার দুয়া দেবেন।" রাজাবাবু কিছু উত্তর দিলেন না।

—নয়—

পরদিন সকালবেলায় মালতী নায়েব বাবুর উঠানে কি কাজ করছে। গিন্নী রান্না ঘরে। হরিচরণ বড় ঘরের দাওয়ায় ব'সে জল-যোগ করছেন। এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। মালতী কাউকে কিছু না বলে, কাজ ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে দৌড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে হরিচরণকে বললে।

"বাবা, রাজা বাবুর বড় কালো ঘোড়াটা, পিঠে কেউ নেই, ছুটে পালাল রাজবাড়ীর পথে।"

"বাবু তাহলে নিশ্চয় আমবাগানে এসেছেন। গিন্নী, খাবার তুলে রাখ।" ব'লে গুড়, মুড়ী, দুধের বাটি ফেলে উঠে পড়লেন নায়েব বাবু। খিড়কীর দোরের কাছ বরাবর গেছেন, এমন সময় একজন মজুর চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল, "নায়েব বাবু, শীগগীর এস। রাজা বাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন। কোন সাড় নেই।"

"কোথায় তিনি রে? আমায় শীগগীর নিয়ে চল।"

"আমবাগানের মেটে বাঙ্গলার দাওয়ায় তাঁকে তুলে শুইয়েছে চৌকীদার। আমাকে পাঠালে তোমাকে খবর দিতে।"

মালতী দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নায়েবকে বললে, "বাবা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

"আচ্ছা, তা আয়। এক ঘড়া জল তুলে নিয়ে চল্।"

মেটে বাঙ্গালার দাওয়ায় চৌকীদারের মাদুরের উপর রাজাবাবু চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন। মাথার নীচে একটা পাট করা গামছা। একেবারে স্পন্দহীন। সর্ব্বাঙ্গে ধূলো, কিন্তু রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে না। মালতী বাবুর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসল, আর আঁচল ভিজিয়ে ভিজিয়ে খুব সন্তর্পণে কপালে, চোখে, মুখে, জল দিতে লাগল। একটু পরে রাজাবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে, "বাবু, বাবু, রাজাবাবু গো!" অমরেন্দ্র কোন সাড়া দিলে না। চোখ খুলে দেখলেও না। হরিচরণ বসে পা ঘসে দিচ্ছিল। মালতী তাঁকে বললে, "কই, এখনও সাড় নেই। বাবা, তুমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে এস।" চৌকীদারকে বললে, "সনাতন দাদা, তুমি হাত পা ঘসে দাও বাবুর। বস, খুব আস্তে আস্তে দিও।"

হরিচরণ চ'লে যাওয়ায় প্রায় মিনিট পনের বাদ অমরেন্দ্র একবার "উঃ!" ব'লে পাস ফিরল। মালতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "বড্ড লেগেছে, রাজাবাবু?" কিন্তু কোনও উত্তর পেলে না। আবার জল নিয়ে সে চোখে, কপালে, হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কথাই সে ভাবছিল। গেল সাত দিন তার যে কি ক'রে কেটেছে তা ভগবানই জানেন! সে বেশ বুঝেছে যে রাজাবাবুকে না দেখতে পেলে তার চোখে সারা দুনিয়া অন্ধকার। রাজাবাবুর মত মানুষ কি আর আছে! বড় লোকের ঘরে জন্মে গরীব দুঃখীর জন্য যার এত দরদ, সে ত দেবতা! এমন মানুষকে ভগবান নিয়ে যাবেন, এও কি সম্ভব! তিনি গেলে, কত লোক কাঁদবে। আর সে, মালতী, তার উপযুক্ত সাজা হবে। কেন সে মেজাজ ক'রে সেদিন

রাজবাড়ীতে গেল না? কেন তার দেবতার ডাক অগ্রাহ্য করলে? তার সেই পাপেই বুঝি আজ রাজাবাবু চলে যাচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে বেচারার দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সনাতন দেখতে পেয়ে চুপি চুপি বললে, "কাঁদিস্ না, মালতী, বাবু আমাদের এখনই সেরে উঠবেন।"

"তাই হোক্, সনাতনদা তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ঠাকুর, তুমি আমার রাজাবাবুকে বাঁচাও। আমি শিবনগরে কাল ভৈরবের মন্দিরে এক টাকা খরচ ক'রে পূজা দেব। আমি নবিগঞ্জের পীরের আস্তানায় পাঁচ আনার বাতাসা দেব। কালভৈরব, পীর সাহেব! তোমরা আমার বাবুকে রক্ষা কর। আর--", একটু থেমে মনে মনে বেশ জোর করে বললে, "আর, বাবু আমায় ডাকলে এবার না বলব না।"

এই কথা মনে হতেই দেখে, রাজাবাবুর চোখ খুলেছে, তার ডান হাত নিজের হাতে ধ'রে কপালে চেপে জিজ্ঞাসা করছেন "কে? মালতী?"

মালতী ভক্তি ভরে ভুঁইয়ে মাথা ঠেকিয়ে ভারী গলায় বললে, "হ্যাঁ রাজাবাবু, আমি। তুমি ভাল আছ?"

রাজাবাবু তার হাত ছাড়লেন না। তাঁর ঘোরটা তখনও কাটে নেই। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "মালী, তুই উঠিস্ না, লক্ষ্মীটী!"

অল্পক্ষণের মধ্যে হরিচরণ, ডাক্তারবাবু ও দেওয়ানজী এসে উপস্থিত হলেন। রাজাবাবু তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কথা কইলেন না। মালতীর হাত চেপে ধ'রে রইলেন। আবার চোখ বুজলেন।

দেওয়ানজী বললেন, "হরিচরণ, বাবুকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা যাক্‌, পালকী ডাকাও।"

ডাক্তার কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন, "আমি আগে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখি, তার পর বলতে পারব।" পাসে ব'সে সর্ব্বাঙ্গ খুব সাবধানে পরীক্ষা করলেন। তার পর দেওয়ানজী ও নায়েব বাবুকে এক পাসে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কিছু ভাঙ্গে টাঙ্গে নেই। কাটাকুটিও বিশেষ দেখছি না, এক আধটু আঁচড় লেগেছে মাত্র। কিন্তু এখনও ঘোরটা কাটে নেই। বুক ধড়ফড়ানিও একেবারে যায় নেই। এখান থেকে সরান হবে না আজ।"

বিকেলের দিকে চাকর-বাকর বিছানা পত্র নিয়ে এসে পড়ল রাজবাড়ী থেকে। হরিচরণ ও ডাক্তার বাবু রোগীকে সন্তর্পণে তুলে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন। তাঁরা দুজনে সে রাত্রি সেইখানেই রইলেন। রাজাবাবু একটু আধটু কথা কইতে পারছিলেন। তিনি মালতীকে কাছে বসতে হুকুম করিলেন। দুধ পথ্য যা খাবার, তার হাতেই খেলেন। রাজবাড়ীতে একজন মাত্র মহিলা থাকতেন, দূর সম্পর্কের পিসীমা। তিনি বিধবা মানুষ। ভাইপোকে একবার দেখে শুনে, গোছগাছ ক'রে দিয়ে, পালিয়ে গেলেন। দাওয়ার উপর বাগদী, দুলেনী দেখে তাঁর অমূল্য ধন জাতটা সম্বন্ধে বিষম ভয় হল।

পরদিন সকালবেলা অমরেন্দ্র উঠে বসতে পারলেন। মালতী তাঁকে ধ'রে বসিয়ে দিলে। তিনি ডাক্তারকে ডেকে বললেন, "আমি ভালই আছি। আর ঔষধ পত্র দরকার হবে না। আপনি ডিসপেনসারীর কাজ কর্ম্ম দেখুন গিয়ে। সন্ধ্যার দিকে একবার ঘুরে যাবেন।"

হরিচরণ আপনা হতেই হুজুরের অনুমতি প্রার্থনা করলে খামারে ফিরে যাওয়ার। রাজাবাবু তাকে ব'লে দিলেন, "দেখ, চাকর-বাকরগুলোকে রাজবাড়ী ফিরে যেতে বল। আমার দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে, একটুও গোলমাল ভাল লাগছে না। দু চার দিন এখানেই থাকব। তোমার বাড়ী থেকে চারটী ক'রে ভাত রেঁধে পাঠাতে পারবে না, হরিবাবু? সনাতন আর মালতী আমার কাছে থাকবে, যত্ন আত্তি করবে। তাহলেই আর কোন কষ্ট হবে না।"

নায়েব বাবু কৃতার্থ হয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ী থেকে রাজাবাবুর খাবার আসবে, তাঁর লোকজন বাবুর সেবা করবে, এ কি কম কথা? এইবার তাঁর আর কোন দুঃখ থাকবে না। জোড় হাত ক'রে বললে, "যে আজ্ঞে, হুজুর।" ব'লে মনের আনন্দে বেরিয়ে গেল আমবাগান থেকে।

পথে দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বাবুর খবর নিতে আসছিলেন। হরিচরণ তাঁকে জানালে যে বাবু ভালই আছেন, তবে একটু নিরিবিলি থাকতে চান, কেন না তাঁর মাথাঘোরা এখনও যায় নেই।

দেওয়ানজী বললেন, "হরিচরণ, ঐ মাথাটা নিয়েই গোলযোগ ঘটেছে। রাজাবাবুর কাছে ও ডল্লে ছুঁড়ীটাকে থাকতে দিয়েছ কেন, বল ত।"

"বেশ কথা, মশায়! আমি থাকতে দিলাম, কি রকম? আপনি ত কাল নিজে কানে শুনে এলেন যে বাবুর হুকুমে মালতী তাঁর কাছে রয়েছে। তা, খুব যত্ন করছে বাবুকে। কে কার করে বলুন, আজ কালকার দিনে? আর, আমাদের কাছে পিঠে থেকে মানুষ হয়েছে কি না, কথাবার্ত্তা চাল-চলন ভদ্দর ঘরের মতন।"

"নায়েব বাবু, তোমার মতলবটা আমি একেবারে না বুঝি, তা নয়। কিন্তু পাপ পুণ্য জিনিসটাকে মান ত?"

"মশায়, পাপ পুণ্য আপনার আমার জন্য: বড় লোকে আবার ও সব নিয়ে মাথা ঘামায় না কি! তা, পাপই বা কোথায় দেখলেন আপনি? তুলেনীকে আজই বুঝিয়ে সুজিয়ে সরিয়ে নেব। বাড়াবাড়ি হতে দেব না। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন।"

দেওয়ানজী কাজ-কর্ম্মে বিচক্ষণ হলেও সাংসারিক বিষয়ে অল্পবুদ্ধি। নিজের পূজা অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন। তিনি এ বিষয়ে আর কিছু বললেন না। আপন পথে চলে গেলেন।

খামারে ফিরে হরিচরণ দেখলে ওস্তাদজী এসেছেন। বললে, "সেলাম সাহেব। রাজাবাবু আজ ভাল আছেন। আপনি কখন ফিরলেন?"

"রাত্রে ফিরেছি, নায়েব বাবু। সকাল উঠেই জানতে পারলাম রাজাবাবুর কথা। দেখতে যাব, কি না যাব, ভেবে ঠিক করতে না পেরে আপনার কাছে এসেছি।"

"না, ভয়ের কোন কারণ আর নেই। ভগবানের ইচ্ছায় দুই এক দিনেই সেরে উঠবেন। আপনাকে আমি নিয়ে যাব ও বেলা। এখনও রাজাবাবু বড় কাহিল, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।"

"কাছে কে আছে? ভাল করে সেবা শুশ্রূষা হওয়া চাই ত!"

"মালতীকে দেখেছেন ত? সেই কাছে আছে। খুব সেবা করছে, ওস্তাদজী। খাবার দাবার আমার বাড়ী থেকে সব যাচ্ছে।"

ওস্তাদজী হাসলেন। কথার ভাবে বুঝলেন যে নায়েব বাবুর মন আজ আনন্দে ভরপুর। কেবল এইটুকু বললেন, "নায়েববাবু, আপনি

যথার্থই হুশিয়ার লোক। তবে আমার মালতী মায়িকে একটু দেখবেন। সে বেচারার কেউ নেই।”

“না, ওস্তাদজী, তার আমি কোন নোকসান হতে দেব না। এইমাত্র দেওয়ানজীকে বলছিলাম তাকে আমি দুই এক দিনেই সরিয়ে নেব।”

ওস্তাদজী আবার হাসলেন।

মালতীকে সরিয়ে নেওয়া কিন্তু হল না। রাজাবাবু শরীরের ছুতো করে সারা গরমি কালটা আমবাগানের আটচালাতেই কাটিয়ে দিলেন। মালতী খামারে থাকত, তবে আগেকার মতন নয়। নায়েব বাবুর বাড়ীর ভেতরের কাজ আর তাকে করতে হত না। গিন্নীমা তাকে ডেকে বারণ করে দিয়েছিলেন, “তুমি যাও, রাজা-উজীরের কাজ করগে। গরীবের বাড়ী ঢুকো না।”

সে গোয়ালের কাজ কর্ম্ম সেরে, দুবেলা যেটে বাঙ্গলায় উপস্থিত হত। সেখানকার ছোট বড় সকল কাজের ভারই তার আর সনাতনের উপর ছিল। রাজাবাবু আমবাগানে চাকর বাকর আনতেন না। সকালবেলা নানা মৌজার প্রজারা আসত বাবুর কাছে। তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে, তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনে, সকালটা কেটে যেত। দশটার সময় রাজবাড়ী গিয়ে খেয়ে দেয়ে রাজাবাবু দপ্তরে বসতেন। পাঁচটার সময় উঠে বাগানে ফিরতেন! ওস্তাদজীর সান্ধ্য জলসা হত উঠানে মাদুর পেতে। মালতী অনেক সময়ই এক পাশে ব’সে গান শুনত। এখন আর বড় একটা গুরু-গম্ভীর ধ্রুপদ গাওয়া হয় না। খেয়াল টপ্পা গজলেই সময় কেটে যায়। সন্ধ্যার খাবার হরিবাবুর

বাড়ী হতে আসে। মালতী বাবুর প্রসাদ পেয়ে বাসন-কোসন ধুয়ে গোয়াল ঘরে ফিরে যায়। সনাতন রাত্রিতে বাবুকে আগলায়।

যখন বর্ষা নামল, অমরেন্দ্র রাজবাড়ীতে থাকতে গেলেন বটে। কিন্তু রোজ সন্ধ্যাবেলায় গান বাজনার চর্চ্চা হত বাগানেই। বাবু না থাকলেও মালতী ঘর দোর সব ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখত। হপ্তায় এক দিন, প্রধানতঃ শনিবার, অমরেন্দ্র বাগানেই রাত কাটাতেন। সেদিন দেরী পর্য্যন্ত গানের জলসা চলত।

বাবুর এই বাগান-বাস সম্বন্ধে প্রথমটা নানা রকম কানা-ঘুষো চলেছিল বই কি। কিন্তু যখন দেখা গেল, যে তিনি তাঁর কাজ কর্ম্মে একটুও ঢিলে দেন নেই, আর বাগানে তাঁর কাছে কোন সুন্দরী থাকে না, তখন সবাই ধরে নিলে যে এই মেটে চালায় বাস একটা নির্দ্দোষ বড়মানুষী খেয়াল মাত্র। সেখানে কে বাগদী, কে দুলের মেয়ে, ঘর ঝাঁট দেয়, উঠান নিকোয়, তার খবর কেউ রাখত না।

কিন্তু হরিচরণের কি হল? সে বেচারা বড় নিরাশ হয়েছে। রাজাবাবুর সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্টতা হয়েছে বটে, কিন্তু সে কতটুকু! তার বাড়ী থেকে খাবার এখনও আসে। আর সেজন্য বাবুও তার গিন্নীর কাছে গিয়ে নানা রকমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এসেছেন। তাকে কিন্তু কোন দিন একটা কথাও বলেন নেই। মালতীরই বা হল কি! সে ভাল গহনা সাড়ীও পরলে না, বাবুর কাছে থাকতেও গেল না। তবে তার অগাধ ধৈর্য্য। ভাবছে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, এ রকম কত দিন চলবে? আচ্ছা, মালতী ছুঁড়ীটার কি সত্যি এত বুদ্ধি, যে বাবুকে খেলাচ্ছে? না, তা হতে পারে না।

গিন্নীর কাছে হরিবাবু অনেক গালাগালি খেয়েছে, এখনও খাচ্ছে। তবে পেটে খেলে পিঠে সয়। রাজাবাবুকে ত কতকটা বাগিয়েছে! পূজার পর একদিন বাবু তাকে রাজবাড়ীতে ডেকে বললেন।

"নায়েব বাবু, মালতীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাকে একটু দেখো শুনো। যদি তাকে রাজী করতে পার, ত তার থাকবার জন্য একটা পরিষ্কার ঘর তুলে দিও।"

পরদিন, মালতীকে জিজ্ঞাসা-পড়া করতে করতে হঠাৎ বুঝতে পারলে হরিচরণ যে ব্যাপারখানা কি। বললে, "মালী, নিজেকে একটু দেখিস্ শুনিস্! একটা অনর্থ বাধাস্ না। তাহলে রাজাবাবু আমাকে বধ করবে।"

—দশম—

কয়েক মাস হয়ে গেছে। আবার বৈশাখ ফিরে এসেছে। সন্ধ্যার সময়, প্রায় আটটা। এইমাত্র কালবৈশাখীর একটা ঝড় হয়ে গেল। এখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিক অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে কড় কড় করে বাজ ডেকে উঠছে, আর এক একবার চোখ ঝলসে দিয়ে বিজলী চমকাচ্ছে। যেন ইন্দ্ররাজ আর বৃত্রাসুর ভীষণ যুদ্ধে মেতেছেন। তাঁদের হুঙ্কারে, তাদের দাপটে, তাঁদের বাণবর্ষণে, ত্রিভুবন কম্পমান।

রাজকুমার অমরেন্দ্র ওস্তাদজীকে নিয়ে রাজবাড়ীর এক ঘরে সঙ্গীত চর্চ্চায় বসেছেন। ওস্তাদজী সেতার বাজাচ্ছেন আর রাজাবাবু সঙ্গৎ করছেন। রাজাবাবুর বড় মিঠে হাত, সচরাচর সঙ্গৎ খুব জমে। আজ কিন্তু কেবলই তাল কেটে যাচ্ছে, আর আহমদ সাহেব ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। শেষ, রাজাবাবু হায়রান হয়ে বাঁয়া তবলা ফেলে দিয়ে বললেন "ওস্তাদজী মিছে চেষ্টা। সঙ্গৎ আজ কোথা থেকে হবে? বাহিরে ঝড় তুফান, অন্তরেও তাই। লেশ মাত্র শান্তি কোথাও নেই। কাল সকাল উঠে হয় ত শুনব যে আমার আকাশ পাতাল সব উলট পালট হয়ে গেছে।"

বৃদ্ধ আহমদ সাহেব একটু আশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন, জনাব? ঝড় তুফান ত চিরদিনই আসে। আসে, আবার কেটে যায়। শান্তিই দুনিয়ার নিয়ম।"

"আপনি ত জানেন, ওস্তাদজী, যে আমি বিরোধের, অশান্তির, বিরোধী। আমি চাই শান্তি, কিন্তু পাই কই?"

এমন সময় একজন খানসামা এসে বললে যে সদর-নায়েব বাবু নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। অমরেন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন। পালকী তৈয়ার ছিল, কিন্তু তাতে উঠলেন না। এক রবারের কোট প'রে হন হন ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। হাত নেড়ে কাউকে সঙ্গে আসতে মানা করলেন! হরিচরণ লণ্ঠন ধ'রে পথ দেখিয়ে চললেন।

খামার বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়?"

"গোয়াল ঘরে, ধর্ম্মাবতার।"

"কেন? তোমায় আমি কি হুকুম দিয়েছিলাম?"

"শুনলে না, হুজুর, কথা। বললে, যেখানে আমি জন্মেছি, যেখানে আমার বাপ মা মরেছে, সেই গোয়াল ঘরে আমার ছেলে হবে।"

রাজাবাবু কিছু বললেন না। গোয়ালের বাহিরে থেকে হরিচরণ ডাকলে, "মঙ্গলা!" তার পর দুজনে ভেতরে ঢুকলেন। ভুঁইয়ে চেটাই বিছিয়ে শুয়ে মালতী, তার পাসে একটী ছোট্ট খোকা। অমরেন্দ্র হাত বাড়াতে মঙ্গলা ধাই খোকাকে তাঁর কোলে দিলে। হরিচরণ বললে, "দেখুন, হুজুর, কি সুন্দর মুখ! ঠিক যেন রাজপুত্র!"

রাজাবাবু উত্তর দিলেন না। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। মালতী হেসে বললে, "না, বাবা। দেবারু আমার জুলেনীর ছেলে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিজের অবস্থা কখন না ভোলে।"

রাজাবাবু হেসে মালতীর চিবুক ধ'রে বললেন, "ওর মা ত কোন

দিন ভোলে নেই, মালী! তাই ত ওর জন্ম হল, রাজার বাড়ীতে নয়, গোয়াল ঘরে। তা হোক গে, এখন ভাল আছিস্, মালতী?"

"হ্যাঁ রাজাবাবু, আমি খুব ভাল আছি। কি দুর্য্যোগ বাহিরে আজ! আপনি রাজবাড়ী যান। আর এই বাদলায় ঘোরাঘুরি করবেন না।"

"না, মালতী! আমি অত দূরে সুস্থির থাকতে পারব না। আম বাগানে যাচ্ছি। আয় না তুই ও সেইখানে।"

"বাবু, ও কথা আবার কেন? তুমি ত জান আমি তোমার দাসী, যেখানেই থাকি। যখন সেরে উঠব, তোমার সেবা করতে যাব। এখন আমার নিজের ঘরে থাকতে দাও।"

"আচ্ছা, মালতী। তোর যখন তাই ইচ্ছা, উপায় নেই। আমি ভোরে উঠেই আসব।"

"এসো, রাজবাবু। যাওয়ার আগে একটী কাজ করবে? আমার মাথার কাছে কুলুঙ্গীতে ঠাকুরের ফুল আছে। একটা নিয়ে আমার দেবারুর মাথায় ঠেকিয়ে দাও।"

কুলুঙ্গীতে পেতলের ছোট একটী বংশীধারী মূর্ত্তি। তার পায়ের গোড়া থেকে একটী গাঁদা ফুল নিয়ে অমরেন্দ্র ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন। দিয়ে ছেলের দাড়ি ধ'রে একটু আদর ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

হরিচরণ ও সঙ্গে সঙ্গে বের হল। সে ভাবছিল, "মালীটা যা পারলে না, এই ছেলেটা তাই করবে। বাপের রোজ কাছারী করা বন্ধ করবে। আহা, বেঁচে থাক্!"

পরদিন দুপুর বেলা গিন্নী মালতীকে দেখতে এলেন। মালতী গলায় কাপড় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। গিন্নীর দয়ার শরীর। ছেলের জন্য

কাপড়, মালতীর জন্য একখানা পুরোনো কাঁথা, এক ঘটী দুধ, কিছু বাতাসা, এই সব নিয়ে এসেছেন। এ ক'মাস মালতীর উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তাকে বাড়ী ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিলেন, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে এ বিষয়ে অনেক ভেবে স্থির করেছেন যে মালতীর দোষ কি? দোষ তাঁর লক্ষ্মী-ছাড়া স্বামীর, আর দোষ ঐ জমীদারের ছেলেটার। গরীবের মেয়ে, ওর চরম দুর্দ্দশা হল। এইবার জমীদার কোন্ দিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, ছেলেটাকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরবে! মালতীকে স্নেহের সুরে বললেন, "মালী, খোকাকে দোরের কাছে আনতে বল্ ত, একবার দেখি। ও মা, এই যে দিব্যি ছেলে হয়েছে! বেঁচে থাক্, আহা, বেঁচে থাক্!"

মালতী শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসল। বললে, "ও কি, মা! চোখের জল ফেলছ কেন?"

"মালী, কেন চোখের জল ফেলছি তাই যদি বুঝবি, ত তোর এ দশা হবে কেন?"

"ছি, গিন্নীমা, ও কথা বোলো না। দেবারু আমার বেঁচে থাক্ তোমার আশীর্ব্বাদে। আমি গতর খেটে ওকে মানুষ করব। তুমি আমার উপর রাগ করেছ, জানি মা। কিন্তু তুমি বুঝলে না, যে আমি আমার রাজার ডাক কি ক'রে অমান্য করব? তিনি আমার মনেরও রাজা, দেহেরও রাজা। আমাকে চরণে রাখেন রাখবেন, ফেলে দেন ফেলে দেবেন, আমি ত তাঁর দাসী বাঁদী বই কিছু না।"

"মুখে আগুন অমন রাজার," ব'লে গিন্নী গরগর ক'রে বেরিয়ে

"না, দেওয়ানজী মহাশয়। তা মোটেই নয়। কাল রাত্রে সেই দুর্য্যোগে রাজাবাবু ছেলে দেখতে এসেছিলেন। আর সেই অবধি আমবাগানে রয়েছেন। কেবলই যাওয়া আসা করছেন। এত দিন দোষ যাই হয়ে থাকুক, রাজাবাবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলছিলেন। কিন্তু এইবার একটা ঢলাঢলি কাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা।"

"মেয়েটাকে গুম ক'রে দেব? তোমরা সবাই বল, ত তাই ক'রে দিই।"

"না বাবা, তাতে হিতে বিপরীত হবে। আমি আপনাকে বলতে এলাম, যে সব চেয়ে ভাল হয়, যদি বৌরাণী এসে নিজের জিনিস নিজে দেখে নেন। আপনি মহারাজকে লিখে বৌরাণীকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথা আমার বলবার আছে। ঐ দুলে ছুঁড়ীকে আমি নিজে হাতে মানুষ করেছি। ওর কিছু খারাবী না হয় দেখবেন। রাজাবাবু ওকে ছাড়লে, আমি ওকে আর ওর ছেলেকে আমারেই রাখতে পারব। যদি নিতান্তই ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হয়, ত আপনি দেখবেন যে ওদের অন্নকষ্ট না হয়।"

"আচ্ছা মা, আমি দেখছি কি করা যেতে পারে। তুমি হরিচরণকে খুব ব'কে দিও, ও যেন আবার কোন গোল না বাধায়।"

এর কিছুদিন পরে দেওয়ানজী বৃন্দাবন থেকে মহারাজা বাহাদুরের এক পত্র পেলেন।

"কল্যাণীয়েষু।

দেওয়ান বাবাজী, তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত

হইলাম। মহারাণীর ইচ্ছা যে বধুরাণী মাতাকে রায়নগরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা সত্বর করা হয়। সেই মর্ম্মে শ্রীমান্‌কে ও বেহাই মহাশয়কে পত্র লিখিতেছি।

শ্রীমানের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি এত বিচলিত হইও না। রাজার ছেলে, উঠতি বয়স, এরূপ একটু আধটু হওয়ারই কথা। তবে একটা ঢলাঢলি হয়, ইহা আমারও অভিপ্রেত নহে। আমিও হিরণ্যকশিপু নহি, আমার পুত্রেরও প্রহ্লাদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই সব গোলমালে যদি প্রজার মঙ্গলের নেশাটা কাটিয়া যায় ত মন্দ কি?

৺মধুসূদন জীউ তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।"

—এগার—

বৌরাণী শান্তা দেবী আজ কয়েক মাস হল শ্বশুরবাড়ী এসেছেন। স্বয়ং মহারাণী বৃন্দাবন থেকে এসে তাঁকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে, ফিরে গেছেন। বহুকাল পরে রাজবাড়ী লোক জনে আবার গম্ গম্ করছে। নূতন রাণীকে খুশী করবার জন্য সবাই শশব্যস্ত, রাজাবাবু হতে ক্ষুদ্রতম দাসীটী পর্য্যন্ত।

হরিচরণের অবস্থা বড় শোচনীয়। সে কিছুতেই মতি স্থির করতে পারছে না। রাজাবাবুর মনের গতিও বুঝতে পারছে না। বড় লোকের ধুয়ো ধরা কি সহজ ব্যাপার! মালতীকে গিন্নী ঘরের কাজে আবার বাহাল ক'রে নিয়েছেন। আদর যত্ন করেন আগের চেয়ে বেশী, তবু কম নয়। তবে কথায় কথায় বলেন, "বড় লোকের আদর দরদ ত দেখলি! আর রাজাবাবু, রাজাবাবু, করিস্ না। নিজের কাজ কর্ম্ম আছে, ছেলেটী আছে, তাই নিয়ে থাক্।" মালতী কিছু উত্তর দেয় না এ কথার, কিন্তু বাবু আমবাগানে এলেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে আসে। খামার বাড়ীতে আর বাবু পা দেন না।

গেল দিন দশেক রাজাবাবু এদিকে আসেন নেই। মালতীর মন বড় উচাটন হয়েছে। বিকেল বেলায় কাজ কর্ম্ম সেরে সে দেবারুকে কোলে করে আম বাগানে গেল। দূরে থেকে শুনতে পেলে, ওস্তাদজী গাইছেন, "মুঝে বতা দে, সখী, কওন গলি গয়া শ্যাম।" বুক দুড় দুড়-করে উঠল।

আজ তাহলে দেখা পাবে, এত দিন পরে। কিন্তু মেটে ঘরের কাছ বরাবর যেতেই বুঝতে পারলে যে আহ্মদ সাহব একা বসে গান গাইছেন। তিনি তাকে দেখে দৌড়ে এলেন।

"কে, মালতী মায়ি? এস, ব'স: রাজাবাবুকে অনেক গান শুনিয়েছি, আজ তোমাকে শোনাব। খোকা বাবুকে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে নিয়ে গালে ঠোনা মেরে বললেন, "কি বল? গান শুনবে, কুঁবর সাহেব?"

মালতী ব'লে উঠল, "না, না, কাকা। ওকে কুমার সাহেব বোলো না। ও দেবারু দুলে। দেবতার দান। কিন্তু মালতী দুলেনীর ছেলে।"

ওস্তাদজী হেসে বললেন, "আচ্ছা মায়ি, তাই। দেবারু তোমার বেঁচে থাক্! খোদা ওকে রাজা মহারাজার চেয়েও বড় করবেন। আমি ওর বুড়ো দাদা, ওকে দুয়া করছি। ব'লে এক গজল ধরলেন। এই দুনিয়াতে এক মোহবৎই সার পদার্থ আর সবই বুজরুকী, ভেলকী, মেকী। ভাই, কেবল দাও, দাও, নিঃশেষে দিয়ে ফকীর হও। কিন্তু পাওয়ার আশা কোন দিন কোরো না। গানের যেমন ভাষা তেমনি সুর, একেবারে প্রাণের অন্তঃস্থলে পৌঁছায়। মালতী তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। ইতিমধ্যে কখন যে রাজাবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, কারও খেয়াল নাই। গান শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "মালতী, ভাল আছ?"

গলার আওয়াজ শুনে মালতী দেবারুকে বুকে চেপে ধরে, চোখ মুছতে মুছতে দাঁড়িয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি ভাল আছেন, বাবু? অনেক দিন দেখতে পাই নেই। বৌরাণী ভাল আছেন?"

রাজাবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, "হ্যাঁ, ভাল আছি। কাজের হিড়িকে কদিন এদিকে আসতে পারি নেই।"

এমন সময় দেবারু "বা—বু" ব'লে দু হাত বাড়ালে। অমরেন্দ্র কিন্তু তাকে কোলে নিলেন না। শুধু আদর ক'রে গাল টিপে দিয়ে বললেন, "কি রে খোকা, কেমন আছিস্? এইবার যে দিন আসব, তোর জন্য খেলনা নিয়ে আসব।"

মালতী মাথা নীচু করে দাড়িয়ে ছিল। কিছু বললে না। গল্প জমল না মোটেই। একটু পরে রাজাবাবু ওস্তাদজীকে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক্। আজ রাজবাড়ীতে গান শোনাবার কথা আছে, ভুলে যান নেই ত?

"না হুজুর, ভুলব কেন? চলুন। আসি তবে, মালতী বিবি।"

যাওয়ার সময় রাজাবাবু মালতীকে বললেন, "আজ ছুটী দে, মালতী। আবার শীগগীর একদিন আসব। তোর কোন কিছুর দরকার হলে আমায় জানাস্।" উত্তরে, মালতী গলায় কাপড় দিয়ে বাবুর পায়ের ধুলো নিলে। তার পর দেবারুর দু হাত ধ'রে তাকেও প্রণাম করালে।

পথে যেতে যেতে আহমদ সাহেব ধীরে গম্ভীর ভাবে বললেন, "হুজুর দুনিয়ার সুরু হতে এই চ'লে আসছে। কতকগুলো লোক অকাতরে ভক্তি ভালবাসা দিয়ে আসছে। আর অন্য কতকগুলো মানুষ সেই ভক্তি ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এই দুই জাতের লোকের মধ্যে, বড় কে, যথার্থ মানুষ কে, কখনও ভেবে দেখেছেন, জনাব?"

অমরেন্দ্র চমকে উঠলেন। তারপর একটু থেমে উত্তর দিলেন, "ওস্তাদজী, আপনি ত জানেন যে চিরদিনই আমি এই ভেদের কথা

ভাবছি। কিন্তু জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। দুটো কর্ত্তব্যের মাঝে পথ যে ঠিক করতে পারি না।”

“তা পারতেন, হুজুর, সহজেই পারতেন। যদি মোহের বশে নিজের সহজ শক্তিকে না হারাতেন। আমি আপনার ওস্তাদ হলেও তাবেদার। হয় ত, আমার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমি না ব'লে থাকতে পারছি না। চৌদ্দ পুরুষের জমীদার হয়েও আপনি যখন প্রজার হৃদয় জয় করতে বেরিয়েছিলেন, আপনার অসীম শক্তি ছিল। কিন্তু যখন এক অতি ক্ষুদ্র অসহায় প্রজার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় পথের পাসে ধুলোয় ঠেলে ফেলে দিলেন,—না জনাব, আর বলব না, আপনার অনেক নিমক খেয়েছি। কিন্তু এ গরীব সুফী ফকীরকে এইবার রোখসৎ দিতে হবে। এ হাওয়ায় সে বাঁচবে না।”

আহমদ সাহেব তিন বার সেলাম করে অন্য পথ ধরলেন। অমরেন্দ্র কিছু বললেন না। আস্তে আস্তে পা ফেলে মাথা হেট করে রাজবাড়ীর দিকে হেঁটে চললেন। ঘোড়ায় উঠলেন না।

বাড়ী পৌছে সোজা ওপরে গেলেন। বৌরাণী গাড়ী বারান্দার উপর এক তক্তাপোশে বসে রয়েছেন। সামনে সোনার বাটায় পান। পাসে রূপোর থালে দুটো মালতী ফুলের গ'ড়ে মালা, ভিজে রুমাল ঢাকা। গালে হাত দিয়ে কি ভাবছেন। অমরেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনেই দৌড়ে কাছে এসে, ঠোঁট ফুলিয়ে অনুযোগ করলেন।

“এসেছ, রাজাবাবু! কত দেরী করলে বল দেখি! সেই ছ'টা হতে বসে আছি এমনি করে। মালা দুটো প্রায় শুকিয়ে গেল। কোথা গেছলে?”

"আমবাগানে বেড়াতে গেছলাম।"

"রোজ রোজ আমবাগানে কেন যাওয়া? কার সঙ্গে গেছলে?"

"ওস্তাদজী ছিলেন। রোজ আর কোথায় যাচ্ছি বল! [illegible] দু হপ্তা পরে আজ এই গেছলাম।"

"না, তোমাকে আর আমি যেতে দেব না। গেলেই তুমি কি রকম মুখ ভার করে ফিরে এস।"

"আজ মনটা ভাল নেই, শান্তা। আহমদ সাহেব হঠাৎ দেশে চলে যাচ্ছেন।"

"তা গেলই বা ও বুড়ো? ওর জন্য এত দুঃখ কেন? [illegible] গান গাইতে জানি গো! আমিই তোমার ওস্তাদ হব।"

"তাই ভাল। আজ থেকে বৌরাণী শান্তাদেবী আমার ওস্তাদ হবেন। চল, গান শেখাবে চল।"

শান্তা স্বামীকে টেনে তক্তাপোশে বসালে। তার পর মালা দুটী বের ক'রে বললে, "এস, সাকরেদ। আগে ওস্তাদের খোঁপায় এক গাছা মালা পরিয়ে দাও। কি বেরসিক লোক, বাবু! এ সবও ব'লে দিতে হয় না কি?"

অমরেন্দ্র মালা দুটো হাতে ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ফুলের মালা, শান্তা?"

"মালতী ফুলও চেন না! কি রকম জমীদারী কর তুমি!" মালা দুটো রাজাবাবুর হাত থেকে ফসকে বৌরাণীর পায়ের উপর প'ড়ে গেল।

বৌরাণী হেসে উঠল, "খোঁপায় পরাতে বলেছিলাম, গো! পায়ে শেকল বাঁধতে বলি নেই।"

অমরেন্দ্র মাথা হেট ক'রে রইল। কিছু বললে না। কত কথাই তার মনের ভেতর দিয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল। এই ছাদে ব'সেই বছর দুই আগে সে মালতীকে ধ'রে আনতে হুকুম দিয়েছিল।

বৌরাণী স্বামীর মুখের দিকে একটু চেয়ে দেখে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। আদর করে বললে, "তোমার কি হয়েছে বল দেখি! দিবা-রাত্র অমন ক'রে কেরাণীর মত আপিস করলে কি আর শরীর থাকে! চুপ ক'রে শোও। আমি তোমায় গান শোনাব।" ব'লে জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে কোলে মাথা তুলে নিলে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গান ধরলে, "মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো, সখী জাগো।"

রাজাবাবু চোখ বুজলেন। গানে মুগ্ধ, কি চিন্তায় মগ্ন বলা কঠিন।

পরদিন সকাল বেলা রাজাবাবু কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর বৌরাণী পাল্কী চেপে খামারে হরিচরণের বাড়ী গেলেন। কর্ত্তা ও গিন্নী দুজনেই বাড়ী ছিলেন। বৌরাণী বললেন, "নায়েব বাবু, আমি আমবাগানের বাঙ্গলা দেখতে যাব বলে এসেছি। এখন কি [illegible] য়ে যাওয়া আপনার সুবিধা হবে?"

"সুবিধা অসুবিধা কি, মা? আপনি য[illegible]নেই হুকুম করবেন, নিয়ে যাব। চাবীর গোছা রাজাবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেব আজ। এখন আমি যাই, মা? কাজ অনেক আছে।" ব'লে হরিচরণ পালাল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল,

"এ ত মহা সঙ্কটে পড়লাম, দেখছি। আমবাগানে নিয়ে যাওয়া রাজা বাবুর অনুমতি না পেলে কি ক'রে হতে পারে? বাবুরও গতিক বুঝতে

পারছি না। কদিন এ মুখো হন নেই। কিন্তু এই ত কাল আবার মালীকে নিয়ে গান বাজনা করে গেলেন। বড়লোকের হ্যাপায় পড়ে আমার প্রাণটা যাবে দেখছি! এ দিকে আসল ব্যাপারের ত কিছুই হচ্ছে না। মালীই হোক, বৌরাণীই হোক, বাবুর সারাদিন কাছারী করা ত কেউ বন্ধ করতে পারছে না। তা হলে, আমাদের আমলাবর্গের আর কি সুবিধা হল! সবাই ত আর দেওয়ানজীর মত যোগ বাশিষ্ঠ পড়তে পারে না'!"

এ দিকে বৌরাণী নায়েব গিন্নীর কাছে গল্প করতে বসেছেন। দু চার কথা কয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আমবাগানের বাড়ীতে কি আছে বলুন ত! রাজাবাবু ওখানে গেলেই হাঁড়িপানা মুখ ক'রে ফিরে আসেন। আর দেখলেন ত, আমার যাবার নামে নায়েব বাবু কি রকম আমতা আমতা ক'রে পালালেন।"

গিন্নী আগে থেকে সতর্ক ছিলেন। চট্ করে উত্তর দিলেন, "কি আবার থাকবে, মা! বাবু গরমির দিনে মাঝে মাঝে এসে দুই এক দিন কাটান। নইলে সন্ধ্যাবেলা গান বাজনা করে চলে যান।"

আচ্ছা, তা চাকর বাকর নিয়ে আসেন না কেন?"

"বড়লোকের খেয়াল, মা। যেমন লোকে চড়াই ভাতি করতে যায় না! এ সেই রকম।"

এই ভাবে কথাবার্ত্তা চলেছে, এমন সময় একটী বছর খানেকের ছেলে হামা দিয়ে উঠানে এল। গিন্নীর চোখ সেই দিকে ফিরল দেখে বৌরাণীও চেয়ে দেখলেন। দেখে ব'লে উঠলেন, "এ কাদের খোকা? দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। চেনা মুখ।"

গিন্নী কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই মালতী কুয়োতলার দিক থেকে দৌড়ে এসে খোকাকে কোলে তুলে নিলে।

বৌরাণী বললেন, "দিব্যি মেয়েটী ত! কে ও? ওরই খোকা বুঝি!"

গিন্নীর বুকের ভেতর যে কি করছিল, কে জানে। কেবল মনে হচ্ছিল, "এই যা! সব গেল এইবার।" তবু অনেক কষ্টে স্বাভাবিক স্বরে বললেন, "ঐ মেয়েটা? ও তোমারই খামারের একজন মজুর, মা। আমার ঘরের কাজ-টাজও করে দিয়ে যায়। মালতী, পোড়ার-মুখী, দেখছিস না, বৌরাণী এসেছেন। প্রণাম কর।"

মালতী ক্ষণেক দাঁড়িয়ে রাণীর মুখ দেখে নিলে। মুখটি ভালই লাগল। তার পর নীচু হয়ে একটী গড় করলে। বৌরাণী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মালতী, তুই কি কোন দিন রাজবাড়ীতে এসেছিলি? আমি তোর খোকাকে কোথায় যেন দেখেছি।"

রাজবাড়ী যাওয়ার কথায় মালতী চমকে উঠেছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে উত্তর দিলে, "রাজবাড়ী? না বৌরাণী, কই, আমি কক্ষণও যাই নেই।"

"আচ্ছা এখন ত আমায় চিনলি! আসিস্ একদিন বেড়াতে। খোকাকে আনিস্।"

বৌরাণীকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে হরিচরণ বাড়ীর ভেতর এসে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল। বললে, "এ সহজ মেয়ে নয়। এর চোখে ধুলো দেওয়া ঐ রাজাবাবুর কাজ নয়। মাঝ থেকে আমি একটা বিপদে না পড়ি! বড় দুর্দ্দিন আসছে, গিন্নী। এ সব তোমার কথা না শোনার ফল।"

আগেই বলেছি গিন্নীর দয়ার শরীর। স্বামীকে, এমন সুযোগ পেয়েও, একটু রগড়ালেন না। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "এ দিকে কি কাণ্ড হয়েছে, জান? বৌরাণী মালীকে দেবারুকে রাজবাড়ী যেতে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন। তা যাবে এখন। গেলে দোষ কি?"

"কিছু না, গিন্নী, কিছু না। বৌরাণীকে খুশী করতে পারলে বরং চারটী খেতে পাবে। রাজাবাবুর দৌড় বোঝা গেছে। যা গতিক দেখছি, কোন দিন হুকুম দেবেন ওদের তাড়িয়ে দিতে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নির্ব্বাসন দণ্ড না দিলে হয়!"

"না, না, তুমি ও সব ভেবে মন খারাপ কোরো না। তেমন তেমন দেখ, ত বৃন্দাবন চ'লে গেলেই হবে মহারাজের কাছে। তিনি তোমায় পায়ে ঠেলতে পারবেন না।"

দিন দুই বাদ, গিন্নী খামার বাড়ীর কিছু শাক তরকারী মালতীর মাথায় দিয়ে তাকে রাজবাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। খামারের তরকারী এসেছে শুনে বৌরাণী খুশী হয়ে হুকুম দিলেন, "উপরে নিয়ে আসতে বল।"

রাজাবাবু সেইখানে ব'সে কি লেখাপড়া করছিলেন। হঠাৎ মালতী ও দেবারুকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন। থত মত খেয়ে বললেন, "শান্তা, আমি একটু ঘুরে আসছি। কাজ আছে।" ব'লে বেরিয়ে চলে গেলেন।

বৌরাণী তাঁর মুখের পানে চেয়ে কি রকম চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে দেবারুর দিকে মুখ ফেরালেন। অমনি এক নিমেষে বুঝতে পারলেন দেবারুর মুখ কেন চেনা-চেনা বোধ হয়েছিল। আনমনা ভাবে মালতীকে বললেন।

"তোমার কোন দোষ নেই, মালতী। তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই। কিন্তু রায়নগরে আর তোমাদের থাকতে কেমন ক'রে দিই? আমার নিজের সংসার ত বাঁচাতে হবে। কথাটা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে তুমি।"

মালতী, বোধ হয়, এই মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত ছিল। কেন না খুব শান্ত ভাবে বললে, "না, বৌরাণী। রায়নগরে আমার আর থাকা হবে না। আপনি আজ বললেন, ভালই হল। নইলে আমাকেই দুই একদিনে বাবুর অনুমতি চাইতে হত। আমার নিজের জন্য নয়। এখানে বরং থাকলে, কালেভদ্রে আমার দেবতার দর্শন পাব। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি এখানে কি করে মানুষ করব।

"মালতী, খোকাকে আমি একশো টকা দিতে চাই। নিবি ত?"

"না, দিদি, তা নিতে পারব না। দুলেনির ছেলে একশো টাকা নিয়ে কি করবে? আসি তাহলে, বৌরাণী। যদি তোমার চরণে কোন অপরাধ করে থাকি ত মাপ কোরো। আর একটা কথা। রাগ কোরো না, কিন্তু চ'লে যাওয়ার আগে রাজাবাবুর নিজের হুকুম চাই।" বলে নমস্কার করে, দুলেনী ছেলে কোলে করে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে অমরেন্দ্র ফিরে এলেন। নিঃশব্দে দোতলায় শোবার ঘরে গেলেন, যেখানে গালে হাত দিয়ে শান্তা জানালার কাছে বসে ছিল। ডাকলেন, "বৌরাণী?'

ডাক শুনে বৌরাণী মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এসেছ? কোথায় গেছলে? আচ্ছা, একটা কথা তোমার নিজের মুখে শুনব। বলবে? মালতীর খোকা তোমার কে?"

"আমার ছেলে।"

"মালতী রায়নগর থেকে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে তোমার নিজের মুখ থেকে অনুমতি চায়।"

"যাই, অনুমতি দিয়ে আসি।"

"সে আমার কাছ থেকে ছেলের জন্য টাকা নিতে রাজী হয় নেই। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো। আর, নায়েব বাবুকে হুকুম দিও, ওদের যেন সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। গরীব বেচারাদের কষ্ট না হয়!" শান্তার আর কথা বেরোল না। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। অমরেন্দ্র সজল চোখে একবার ডাকলেন, "শান্তা!" কিন্তু কোন জবাব পেলেন না।

খামারের পথে ওস্তাদজীর বাসা। সেখান দিয়ে যেতে যেতে রাজাবাবু দেখলেন, দোর জানালা সব বন্ধ, সদর দরজায় কুলুপ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "অতীতের সব বন্ধন একে একে ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

গোয়াল ঘরের কাছাকাছি গিয়ে কেমন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল।

"কি বলব? কেমন ক'রে বলব, দূর হও?" খুব আস্তে আস্তে ডাকলে, "মালতী, মালী!" দুলেনী ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। কোলে দেবারু। ছেলেকে নামিয়ে, ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজাবাবুকে প্রণাম করলে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে, চোখ মুছে বললে,

"তোমার নিজ মুখে পাপ কথা বলতে হবে না। দেবারুকে নিয়ে আমি কাল ভোরে চলে যাচ্ছি। আমাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ কর।"

রাজাবাবু মা ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন, "ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। আমাকে ক্ষমা করিস্, মালতী।"

একটু থেমে আবার বললেন, "মালী, দেবারুর জন্য পাঁচশো টাকার নোট এনেছি। ওর হাতে দেব কি?"

মালতী মাথা নেড়ে বললেন, "না, বাবু। দেবারু দুলেনীর ছেলে, টাকা নিয়ে কি করবে? তুমি আশীর্ব্বাদ করেছ, সেই ঢের। আমাকে একটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে, রাজাবাবু?"

"তুই যা চাস্ নিয়ে যা, মালী। কিছু নিলে বুঝব, তুই আমাকে মাপ করেছিস্।"

"রাজাবাবু, তোমার উপর কি আমি রাগ করতে পারি? তুমি যে আমার দেবতা! যে দেবারুকে পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে সে ত তোমারই দান। আমি যেখানেই থাকি, আমি তোমার দাসী। একটা জিনিস তোমার দাসীকে দাও। আর বছর আমার জন্য যে পেতলের গোবিন্দ মূর্ত্তিটী বৃন্দাবন থেকে এনেছিলে, অনুমতি দাও ত সেইটী আমি নিয়ে যাই।"

রাজাবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। "আসি তবে, বাবু?" ব'লে মাল তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে গোয়ালের ভেতর চলে গেল।

মালতীর ছেলে

ছয় সাত বছর হয়ে গেছে। ধবলা নদীর পারে ভুলুয়া ব'লে এক ছোট গ্রাম। গ্রামের এক প্রান্তে নদীর অনতিদূরে একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেটে ঘর। সেই ঘরে মালতী থাকে দেবারুকে নিয়ে। রায়নগর থেকে এসে অবধি এইখানেই আছে। হরিচরণ বলেছিলেন কাছাকাছি কোন গ্রামে বাস করতে, কিন্তু মালতী তাঁর কথা শোনে নেই। সে মন স্থির ক'রে বেরিয়েছিল যে আর রায়নগরের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখবে না। রাজাবাবুর দেওয়া দুটী যে উপহার, এক দেবারু আর দ্বিতীয় সেই গোবিন্দমূর্ত্তি, তাই নিয়ে নূতন ক'রে সংসার পাতবে। পিছটান কিছু মনে থাকতে দেবে না। নায়েববাবুকে এত কথা কিছু বলে নেই। শুধু এইটুকু বলেছিল,

"বাবা, আমি দূরে চলে গেলেই সকলের পক্ষে ভাল। ভুলুয়াতে যাচ্ছি। সেই গাঁয়ে আমার মায়ের বাপের বাড়ী। তারা মানদার মেয়ে বলে আমাকে একটু আদর যত্ন করলেও করতে পারে।"

ভুলুয়াতে মালতীর এখন যে ঘরদোর হয়েছে তা আগের চেয়ে অনেক বড় ও সুশ্রী। কাঠের দরজা জানালা বসেছে। পেছনদিকে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠান। উঠানের এক কোণে ছিটে বেড়ায় এক রান্নাঘর। অন্য দিকটায় এক বড় সজনে গাছ। তার তলায়

গোটা কয়েক গাঁদা ও বেলফুলের চারা। উঠান, গাছের গোড়া, সব যেন তকতক করছে। কোথাও একটা খড় কুটো পর্য্যন্ত পড়ে নেই। ঘর-কন্না দেখে কেউ বলবে না যে দুলে বাগদীর ঘর। তবে মালতী ত আর সাধারণ দুলেনী ছিল না। গ্রামের দুলে পাড়ার আবহাওয়া তার কাছে অপরিচিত। ছেলেবেলা থেকে নায়েব গিন্নীর আদরে মানুষ হয়েছিল। তারপর যৌবনের নেশা লাগতে না লাগতে স্বয়ং রাজার দুলাল এসে তার হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত হলেন। রাজবংশের ছেলেকে সে গর্ভে ধরেছে। আর কি সে মানদা দুলেনীর মেয়ে আছে! যে বন-ফুলের উপর একবার ভৃঙ্গরাজ এসে বসেছেন, সে ত গোলাপ মল্লিকা পদ্ম কুমুদের পংক্তিতে উঠে গেছে।

যত মন শক্ত করেই এসে থাকুক, তার প্রথম প্রথম ভুলুয়াতে বড় একা একা বোধ হত। মনে বড় কষ্ট পেয়েছিল। মানদার এই গাঁয়ে জন্ম হয়েছিল বটে। কিন্তু তার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউ নেই। সব ম'রে হেজে গেছে। ভিটে অন্য লোকের দখলে, মানদাকে কারও মনেই নেই। মালতীকে কেউ আমল দেয় না, চিনতেও চায় না। জমীদারের নায়েব বাবুর হাতে পায়ে ধ'রে নদীর ধারে এই জমীটুকু পেয়েছিল। বড় ভাল লোক এই নায়েববাবু। দয়া মায়ার শরীর। কাছারী থেকে মাল মশলা দিয়ে মালতীর ছিটেবেড়ার প্রথম কুঁড়ে ঘরটা তৈয়ার করে দিয়েছিলেন। চৌকীদারদের তাকিদ দিয়েছিলেন, যেন এই অসহায়া মেয়েটীর উপর নজর রাখে। মালতীর মন এত সরল, সাংসারিক জ্ঞান এত কম, যে সে একবারও সন্দেহ করে নহে যে এই নায়েববাবুর দয়ার পেছনে কোন রহস্য আছে। রহস্যটা কি, তা পাঠক পরে জানবেন।

মালতী যখন রায়নগর হতে আসে, হরিচরণের স্ত্রী তার খোকার হাতে পাঁচটী টাকা দিয়েছিলেন। এ টাকা সে নিয়েছিল, কেন না গিন্নীমাকে আপন মায়ের মতই দেখত। মানদার দরুন খান দুইচার রূপোর গহনা ছিল সে গুলোও মালতী সঙ্গে এনেছিল। ভুলুয়াতে নায়েব বাবুর সাহায্যে সেগুলো বেচে টাকা পনের সংগ্রহ হল। কুঁড়ে ঘরটা তুলতে তার, বলতে গেলে, কিছুই খরচ লাগে নেই। কাজেই সে প্রায় বিশ টাকা পুঁজী নিয়ে সংসার যাত্রা সুরু করলে। গরীব মজুরনীর পক্ষে এ ত অগাধ সম্পত্তি! মালতী স্থির করলে যে এই মূলধনে সহজে হাত দেবে না। দিন গুজরানের জন্য খালে বিলে মাছ ধরত, আর গ্রামে বাড়ী বাড়ী সেই মাছ বেচে আসত। সুবিধা হলে, গেরস্ত বাড়ীতে ঠিকে কাজ কর্ম্ম করে দিয়ে আসত। গিন্নী-মার কল্যাণে সে খুব পরিষ্কার কাজ করতে শিখেছিল। তাই একবার যেখানে যেত, সেখানে আবার ডাক পড়ত। মালতী সধবার বেশে থাকত। পরনে পেড়ে সাড়ী, হাতে শাঁখা, সিঁথায় সিন্দুর। জোয়ান মেয়ে, স্বামীর পাত্তা নেই, অথচ এই বেশ। লোকে একটু কানা-ঘুষো করত বই কি! তবে, ছোটলোকের মেয়ের আবার সতীত্বের কদর কি, এই ত আমাদের ভদ্রলোকের ঘরের বুলি! তাই মালতীর চরিত্র সম্বন্ধে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না। তার ঠিকে চাকরী জোটারও কোন বাধা ছিল না। পয়সার অভাবও বড় একটা কোন দিন ভুগতে হয় নেই। পুঁজীতেও হাত পড়ে নেই। এই রকমে কয়েক মাস কাটল।

সময় সময় কিন্তু বেচারার বড় মন কেমন করত। রায়নগরের

খামার, বলতে গেলে, তার আপন বাড়ীই ছিল। সেখানকার সবাই তার আপনার লোকের মত ছিল।

গিন্নীমার ত কথাই নেই। তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন যে তার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত না লাগে। মাঝে কিছুদিন তিনি রাগ করেছিলেন তার উপর, কিন্তু শেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যি সে নির্দ্দোষ। তখন আগের চেয়ে বরং বেশী আদর করতেন। তার সেই দেশ, ঘর,-বাড়ী, ছেড়ে কত দূরে এসে পড়েছে সে। এখানে বন্ধু বান্ধব, সখী সাথী, দরদী লোক আজও ত কেউ জুটল না!

আর, রাজাবাবু! তাঁর ছবি ত বুকের ভেতর আঁকা রয়েছে। সে ছবি কিন্তু দেখে দেখে সাধ মেটে না। এক একবার মনে হয়, ছুটে চলে যাই রায়নগরে, দূর থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সুন্দর মুখ একটী বার চোখে দেখে আসি। আর সে কোন দিন দেখতে পাবে না সেই মুখ! কেমন ক'রে বাঁচবে! না, এ সব কথা সে মনে আসতে দেবে না। রাজাবাবু ত তার নয়, বৌরাণীর! পরের জিনিসে কেন সে লোভ করবে? যখন মনের মধ্যে এই সব ঝড় বইতে থাকে, ঘরের ভেতর পালিয়ে যায়, ছেলেকে বুকে চেপে ধরে, ঠাকুরের সামনে কাঁদে। গোবিন্দের কাছে সে মনের কথা সব খুলে বলে। সে যদি কোন দোষ ক'রে থাকে, ভুল বুঝে থাকে, গোবিন্দ যেন তাকে ক্ষমা করেন। সে ত অনেক শাস্তি পেয়েছে, আরও শাস্তি যেন ঠাকুর তাকে দেন, কিন্তু তার দেবারুকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন। তাহলেই সে সব সইতে পারবে। এক এক দিন মনে হত যেন গোবিন্দ বলছেন, "তোর কোন ভয় নেই, মালতী। আমি তোর অপরাধ নেব না।"

ভদ্রলোকের মেয়ে হলে এই শারীরিক কষ্ট ও মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে কোন্ দিন পিষে গুঁড়ো হয়ে যেত। কিন্তু মালতী ছোটলোকের মেয়ে। তার পূর্ব্বপুরুষ অনাদি কাল হতে রৌদ্র-বৃষ্টি, অভাব-অনশন, হেনস্থা-অত্যাচারের মাঝে জীবন কাটিয়েছে। সে অত সহজে ভেঙ্গে পড়বে কেন! দেবাক্কুর মুখপানে চেয়ে, তার দেবতার চরণে মাথা রেখে সে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। গাঁয়ের দুলে বাগদীরা তাকে আমল দিত না, অবজ্ঞা ক'রে দূরে দূরে রাখত। কিন্তু এ অবজ্ঞা সে গায়ে মাখত না। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে একদিন সে সকলকে আপনার জন ক'রে নিতে পারবে।

—দুই—

প্রথম বছর কার্ত্তিক মাসে দেবাকুর মেলেরিয়ার জ্বর হল। মাস খানেকেরও বেশী ভুগল। ডাক্তার, পথ্য, কাপড়-চোপড়ে অনেকগুলি টাকা খরচ হয়ে গেল। ছেলে সারলে পর মালতী বড় ভাবনায় পড়ল। কি উপায়ে রোজগার কিছু বাড়াবে? অসুখ বিসুখ ত হবেই। তা ছাড়া ছেলে যত বড় হবে, অন্য খরচও আছে। কিছু টাকা ঘরে আনবার কি উপায়?

রায়নগরের গিন্নীমা শিল্পী মানুষ ছিলেন। নানা রকম সৌখীন জিনিস তৈয়ার করতে পারতেন। বিশেষ ক'রে, তাঁর হাতের কাঁথার খুব কদর ছিল। মহারাণীমার ফরমায়েশে নানা রকম নকশী কাঁথা তৈরী করে তাঁকে বৃন্দাবন পাঠাতে হত। এই কাজে মালতী গিন্নীমার অনেক সাহায্য করত। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। মালতীর বিদ্যা বেশী দূর এগোয় নেই বটে, তবে তার সেলাই বেশ সোজা, আর ফোঁড়গুল খুব সূক্ষ্ম হয়েছিল। ভুনুয়াতে যখন আয় বাড়াবার দরকার হল, তখন সে ভেবে চিন্তে স্থির করলে যে নকশী কাঁথা সেলাই করবে। প্রাণ-পণে লেগে গেল এই বিদ্যার চর্চ্চায়। দেবাকুর জন্মের সময় গিন্নীমা তাকে একখানা নিজের হাতে তৈরী কাঁথা দিয়েছিলেন। তাতে নানা রকম নকশী কাজ ছিল। সেইটে দেখে দেখে নকল করতে আরম্ভ করলে। বছর খানেক অভ্যাসের পর সে বেশ সূক্ষ্ম ফুল তুলতে শিখলে। বোধ হয় তার নিজেরও শিল্পের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল।

কেননা নূতন নূতন নকশা নিজের মাথা থেকেও বের করতে আরম্ভ করলে। যখন তিন চারখানা পছন্দ মত কাঁথা তৈরী হল, তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে তার মুরুব্বী নায়েব বাবুকে দেখালে। তিনি দেখে খুব তারীফ করলেন আর উপদেশ দিলেন হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে।

ভুলুয়া থেকে কোশ দুই দূরে ফি রবিবারে এক হাট বসত। এক হাট-বারে মালতী খানতিনেক ভাল কাঁথা বেছে নিয়ে সেখানে গেল। গেল ত, কিন্তু কোথায় বেচবে, কত দাম চাইবে, কি করে বেচবে, কিছুই জানে না। লজ্জাও করছিল ভয়ানক। ভুলুয়ার এক মুদী সেই হাটে বসত। মালতীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কেন না তার দোকান থেকেই সে ঘরকন্নার চাল দাল, নুন তেল, কিনত। মুদীকে গিয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, এ হাটে কি কাঁথা বিক্রী হয়?"

মুদী বললে, "কেন গো, তুই কাঁথা নিয়ে কি করবি? তোর ছেলে ত মস্ত হয়েছে।"

"না দাদা, আমি কিনব না, বেচতে চাই। নিজে সেলাই করেছি। বিক্রী হলে সংসারের অনেক সুবিধা হয়।"

"কই, দেখি", ব'লে মুদী চশমা এঁটে কাঁথা তিনখানা পরীক্ষা করে দেখলে। দেখে বললে, "তুই এমন সুন্দর সেলাই করতে পারিস, এ ত চমৎকার কাজ রে, মালতী! আমাকেই এ কয়খানা দে না। পাঁচ টাকা পেলে খুসী হবি ত?"

মালতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। বললে, "হ্যাঁ দাদা, নিশ্চয় দেব। পাঁচটা টাকায় আমার অনেক উপকার হবে।"

এই থেকে মালতীর অবস্থা আস্তে আস্তে বেশ স্বচ্ছল হয়ে দাঁড়াল।

একটু ভাল ক'রে ঘর দোর বাঁধলে। ছেলেকে জামা দোলাই সেলাই ক'রে দিলে। দেবারুকে বাবুগিরি শেখাবার তার কোন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া তাকে শেখাবেই। লিখতে পড়তে না শিখলে যে মানুষ হবে না! ছেলে চাকরী করবে, নায়েব গোমস্তা হবে, এ স্বপন সে দেখত না। হাজার হোক্, রাজপুত্র ত, নায়েব হয়ে তার কি মান বাড়বে। তবে দেবারু একটা মানুষের মতন মানুষ হয়, এটা মালতীর বড় সাধ। সে স্থির করেছে যে আর একটু পয়সা কড়ির সুবিধা হলেই কিছু চাষের জমী কিনবে আর দেবারুকে ক্ষেতের কাজ শেখাবে। কিন্তু চাষা হলেই মূর্খ থাকতে হবে, এর ত কোন মানে নেই। রাজাবাবুর কাছ থেকে মালতী এ বিষয়ে কত কথাই শুনেছিল! দেবারুর জন্মের পর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবু কত কল্পনা জল্পনা করতেন মালতীর সঙ্গে! চাষা প্রজাদের সম্বন্ধে তাঁর আশা ভরসার কথা মালতী সবই জানত।

এক দিন তিনি বলেছিলেন, "মালী, যখন ছোট্টটী ছিলাম, তখন থেকেই আমি আমার প্রজাদের ভালবাসি। কতবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে বড় হবে এদের দুঃখ ঘোচাব! ঈশ্বর দিন দেন, ত এদের চাষের জমী এদের হাতে সঁপে দেব, দিয়ে রাজ্যপাট তুলে দেব, নিজেও লাঙ্গল ধরব।"

মালতী মুগ্ধনয়নে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছিল, "তা তুমি পারবে, রাজাবাবু। যদি জগতে এ দিন আসে, ত তোমার মত দেবতার চেষ্টাতেই।"

অমরেন্দ্র বলেছিলেন, "মালী, আগে প্রজাদের দূর থেকে ভাল বাসতাম। আজ তোকে পেয়ে আমি তাদের নিতান্ত আপনার জন

হয়েছি। আমাদের এই ছেলে বড় হয়ে যে দিন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি কারও জুলুম সহ্য করব না। আমি কৃষাণ, দুনিয়াকে অন্ন জোগাই। আমি কারও চেয়ে খাটো নই,' সেই দিন আমাদের এই মিলন সার্থক হবে।"

ভুলুয়াতে এসে অবধি মালতী এই সব কথা বার বার ভেবেছে। তাদের মিলন ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই মিলনের নিদর্শন, এই ছেলেটা, কি এক দিন বাপের আশা পূর্ণ করতে পারবে? উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে পারবে না, তা নিশ্চিত। কিন্তু এ শিক্ষা দেবে কে? বাপ কোথায়, আর ছেলে কোথায়? তার উপর আবার এখন বৌরাণীর একটা খোকা হয়েছে। নায়েব বাবুর কাছে মালতী শুনে এসেছে। রায়নগরে সেই উপলক্ষে কত ধুমধাম হয়ে গেছে কত, কাঙ্গালী গরীব বিদায় হয়েছে! রাজাবাবুর এখন থেকে প্রধান কাজ হল, রায়নগরের ভাবী রাজাকে গ'ড়ে পিটে তৈরী করা। দুলেনীর ছেলেকে মানুষ করা ত তাঁর কাজ নয়। সে ভার একা দুলেনীর মাথায়। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ত মালতীর কত! হয় ত শিব গড়তে বানর গড়বে। সবই নির্ভর করছে এক গোবিন্দের কৃপার উপর।

"ঠাকুর, তুমি গ'ড়ে নিও তোমার ছেলেকে, শিখিয়ে নিও তাকে জগতে তোমার কাজ করতে!"

মালতীর ছোট মুখে এই সব বড় কথা শুনে অধীর হবেন না। তার গুরুভাগ্য যে আশ্চর্য্য রকমের বড়! জন্মে দুলেনী, কিন্তু তার প্রথম শিক্ষক হলেন রাজপুত্র, দ্বিতীয় শিক্ষক স্বয়ং গোবিন্দ। এ অবস্থায় তার কল্পনার দৌড় কতটা হবে না হবে, কারও বলা কঠিন।

দেবারুর শিক্ষার ভার যদি তার বাপের হাতে থাকিত, তা হলে সে হয় ত একজন একেলে কৃষাণ-মজুর দলের দলপতি হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ভার পড়ল তার দুলেনী মা, আর মায়ের ঠাকুরের হাতে। এর যে ফল ফলল, সেটা পাঠকের অনুমত হবে এ আশা আমি করি না।

প্রথম প্রথম সাংসারিক চিন্তা মালতীকে বড় ব্যাকুল করেছিল। কখন ত খাওয়া পরার বিষয় আগে ভাবতে হয় নেই। অভাব অনটন, সারাদিন খাটুনি, বিনিদ্র রজনী, এর মাঝে ছেলের চরিত্র গড়ে তোলবার মত কঠিন কাজে সে হাত দিতে পারে নেই। দু দণ্ড ছেলেকে নিয়ে স্থির হয়ে বসতেই পেত না। ফলে দেবারু সারাদিন রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। শুধু ক্ষিদে পেলে বাড়ী আসত মায়ের কাছে। তার দুরন্তপনার অন্ত ছিল না, কিন্তু মায়ের সত্যি অবাধ্য ছেলে সে কখন হয় নেই। মাকে ভাল বাসত ও যথেষ্ট। তবে বাড়ীতে স্থির হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পায়ে তথা মনে, একটা ঘুরঘুরে পোকা নিয়ে সে জন্মেছিল। পাড়ার মেয়েরা মালতীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত হিংসাই করত। কিন্তু প্রথম থেকেই, তার এই ফুটফুটে সুন্দর, দুরন্ত ছেলেটীকে সকলে ভালবাসত আদর করত। আদর দিয়ে নষ্ট করারও চেষ্টার ক্রটী হয় নেই। মালতী ঠিক বুঝেছিল যে এ রকম বেশী দিন চলবে না। তাই, যখন সে সংসার কতকটা গোছগাছ ক'রে নিলে, হাতে কিছু পয়সাও জমতে আরম্ভ হল, তখনস্থির করলে আর দেরী নয়, ছেলে সাত বছরের হয়েছে, এই বার ইস্কুলে লেখা পড়া শেখাতেই হবে। আর শুধু ডানপিঠেমো ক'রে বেড়ালে কোন দিন কাজের লোক হবে না।

—তিন—

একদিন দুপুরবেলা দেবারুকে ঘরের ভেতর ডেকে মালতী ইস্কুল যাওয়ার কথা পাড়লে। ছেলে একেবারে বেঁকে দাঁড়াল। সে তার অনুগত চাঁড়াল বাগদী ছেলেদের কাপ্তানী ছেড়ে পড়তে যেতে চায় না। কি হবে প'ড়ে? মা অনেক বোঝালে কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। একটু বড় হলেই ত চাষবাস করতেই হবে লেখা পড়া শিখে কি ফল? শেষ মা করলে কি, রঙ্গ-চঙ্গে দুখানা বই পেটরা থেকে বের ক'রে আনলে। বই দুখানা বটতলার সচিত্র রামায়ণ মহাভারত।

বই দেখে দেবারু, "আমার দে না বই, আমি দেখব," ব'লে বায়না ধরলে।

মালতী বললে, "কি বই জানিস্? রাম লক্ষ্মণের কথা, ভীম অর্জ্জুনের কথা, শুনেছিস্ ত! এ সেই গল্প।"

"তোর পায়ে পড়ি, মা, আমায় বল্ না গল্প। আমার বড় ভাল লাগে।"

"আমি কি ক'রে বলব, বাপ! আমি কি পড়তে পারি? তুই পাঠশালে গেলে দুবছরে এ সব পড়তে পারবি। তখন আমাকেও কত কি প'ড়ে শোনাবি! আর লোকের বাড়ী আমাকে যেতে হবে না যাত্রা কথকটা শুনতে।"

দেবারু খানিকক্ষণ বই দুটো উলটে পালটে ছবি দেখলে। তার পর দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত হয়ে বললে, "আচ্ছা মা, আমি পাঠশালে যাব।"

যত শীগ্‌গীর পারি পড়তে শিখব। শিখে তোকে রামায়ণ মহাভারতের কথা শোনাব। তুই কেন যে যাস্ মরতে লোকের বাড়ী যাত্রা শুনতে, জানি না। তারা ত তোকে উঠানে এক কোণে বসিয়ে রাখে।"

"তা রাখবে না ত কি! দুলে বাগদীকে কি আর কেউ ঘরের দাওয়ায় বসায়!"

"মা, তুই আমার সামনে দুলে-বাগদী দুলে-বাগদী করতে পাবি না। আমার সহ্য হয় না। বড় হয়ে দেখে নেব এক হাত সবাইকে। হতভাগা ব্যাটারা! আমার মা দুলে বাগদী!" বলতে বলতে মাথাটাকে এক ঝাঁকানি দিলে, যেন সিংহের বাচ্চা। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, মুখ লাল হয়ে উঠল। দেখে মালতীর অমরেন্দ্রকে মনে পড়ল। ঠিক এমনই হয়ে যেতেন তিনি প্রজাদের দুর্দ্দশার কথা বলতে বলতে। হাসতে হাসতে ছেলেকে মা বললে, "আচ্ছা আগে বড় ত হ', তার পর যা হয় করিস্।"

দেবারু ইস্কুল যেতে রাজী হলে মালতী হেড পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়ে জানালে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন যে নায়েব বাবুর সঙ্গে কথা কইবেন।

পরদিন সকাল বেলা নায়েব বাবু নদীর পারের কুঁড়ে ঘরে এসে বলে গেলেন, "তোমার ছেলের ইস্কুল যাওয়ার সব ঠিক করে দিয়েছি, মালতী। কাল থেকে পড়তে পাঠিও। পণ্ডিত মহাশয় ভট্টাচার্য্য বামুন কি না, একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু আমাদের জমীদার বাবুর ইচ্ছা যে গ্রামের সকল জাতিই তাঁর ইস্কুলে শিক্ষা পায়।"

মালতী হাত জোড় করে বললে, "নায়েব দাদা, তোমার দয়াতেই

এ গাঁয়ে এতদিন আছি। নইলে, আমার আপনার বলতে ত কেউ নেই। একটা কথা বলি, অপরাধ নিও না, দাদা। আমার এখন তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে পয়সার কষ্ট নেই। আমি নিয়ম মত ইস্কুলের মাইনে দেব। আর আমার ভিটের একটা ভাড়াও তুমি ঠিক করে দিও। অনেকখানা জমী ঘেরে নিয়েছি ত!"

"ভিটের ভাড়া আমার বাবু তোকে মাপ করেছেন, বলেছি ত! কিন্তু ইস্কুলের মাইনেটা দিস, ভালই হবে। পণ্ডিতটা বড় অর্থ পিশাচ।"

পরদিন ভোরে উঠে দেবারু নদীতে স্নান করে এল। তার মা তাকে নূতন কাপড় পরিয়ে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেল। সে জোড় হাত করে গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "গোবিন্দ, আমার মা বড় দুঃখী। তাকে তুমি ভাল রেখো। আর, আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি পড়তে শিখে মাকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে পারি।"

তার পর, ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে, মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পাড়ার পলটনের ছেলে মেয়েরা তাকে ইস্কুল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

সেই দিন নায়েব বাবু এক পত্র লিখলেন,

"হরিচরণদা, অনেক দিন তোমাদের কুশল সংবাদ পাই নাই। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জানিতে পারিলে সুখী হইব। মালতী দুলেনী ও তাহার পুত্র ভাল আছে। আজ হইতে পুত্র দেবারু ইস্কুলে যাইতেছে। তোমাদের বৌরাণী মাতাকে জানাইও। আমি মালতীর উপর নজর রাখিয়াছি। তাহার চালচলনে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এরূপ সুন্দর

প্রকৃতির মেয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট ঘরে এমন মেয়ে হয় না। বৌদিদির হাত-যশ, যে একটা ডুলের মেয়েকে এমন শিক্ষা দিয়াছেন। মালতী কখন কাহারও নিকট হাত পাতে নাই, নিজের চেষ্টায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। রাজাবাবুকে অনুরোধ করিও যেন আমার মনিবকে এক কলম লিখিয়া জানান যে আমি যথাসাধ্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছি।

মালতী কোন দিন কাহাকেও তাহার ইতিহাস বলে নাই। এই গ্রামে তাহার মামার বাড়ী ছিল এইমাত্র বলিয়াছে। আমিও তাহার নিকট এ কথা গোপন রাখিয়াছি যে আমার সহিত রায়নগরের কোন সংস্রব আছে। তাহার বিশ্বাস, দয়াপরবশ হইয়া আমি তাহাকে নিষ্কর জমী দিয়াছি ও তাহার খোজ খবর লই।

রায়নগরের নবকুমারের জন্মের খবর তাহাকে কথায় কথায় একদিন বলিয়াছি। সে জানে, এ খবর আমি বঙ্গবাসীতে পড়িয়াছি।

গ্রামের লোক মালতীকে ভালবাসে। ছোট লোকের মেয়েরা প্রথম প্রথম তাহাকে হিংসা করিত ও কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু এখন সে নিজগুণে তাহাদিগকেও বশ করিয়াছে। যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে অন্ন কষ্ট, সেই খানেই মালতী উপস্থিত।

দাদা, আমি কোন দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই যে তোমার বাবুদের এই ডুলে পরিবারের প্রতি এত দরদ কেন। মনে নানা সংশয় আসিয়াছে, কিন্তু মালতীর মত ধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র মেয়ে সম্বন্ধে সংশয় বেশীক্ষণ থাকে না। উপরন্তু, আমি জানি, যে রাজাবাবু অপেক্ষাও রাণীজীর অধিক দয়া মালতী ও দেবারুর প্রতি। যাক্, আমি বেশী কিছু জানিতে

চাহি না। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ?

তোমরা আমার প্রণাম জানিবে। ইতি—

প্রণত শ্রীসীতানাথ সরকার।"

—চার—

দেবারুর ইস্কুলে প্রথম দিনই এক বিভ্রাট ঘটল। হেড পণ্ডিত মহাশয় খাতায় নাম দাখিল করবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবারু, তোর বাবার নাম কি ?"

দেবারু বললে, "আমি ত জানি না, মশায়। বাবাকে ত কখন দেখি নেই। মাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসব এখন।"

দুপুর বেলা বাড়ী গিয়েই মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "মাগো, আমার বয়স কত ?"

"এই আট বছরে পড়েছিস্।"

"হ্যাঁ মা, আমার বাবার নাম কি ? কোথায় তাঁর নিবাস ?"

এ কথা আগেও ছেলে দুই একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু মা কোন রকমে কাটিয়ে দিয়েছিল এই ব'লে যে তিনি দূর দেশে থাকেন। আজ মালতী চুপ করে রইল। দেবারু আবার জিজ্ঞাসা করলে, "বাবার নাম কি, বল্ না। ইস্কুলের খাতায় লেখাতে হবে যে !"

মা ছেলের মুখের পানে চেয়ে রইল, নির্ব্বাক। আস্তে আস্তে তার দু গাল বেয়ে ঝরঝর করে চোখের জল পড়তে লাগল। দেবারুর চোখও ছলছল করে উঠল। মার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "কাঁদছিস কেন, মা ? কিছু দরকার নেই বাবার নামে। নাই বা পড়তে গেলাম আমি ইস্কুলে। তুই কাঁদিস না, লক্ষ্মীটী !"

মালতী একটু সামলে নিয়ে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বললে, "তা কি

হয়, বাছা ? পড়তে যাবি বই কি ! আমার নানা পুরানো কথা মনে এল, তাই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তোর বাপের নাম, আমার ঠাকুরের নাম যা, তাই।"

"গোবিন্দ ?"

মালতী ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই বটে। কিন্তু ছেলেকে ঠকাচ্ছে, এটা তার বড় খারাপ লাগল। উপায় নেই। ঐ টুকু ছেলে, তাকে কি বোঝাবে ? ছেলের পিঠে হাত রেখে বললে, "তুই আগে বড় হ', তার পর একদিন তোকে পুরানো কথা সব বলব।"

"তোর যবে ইচ্ছা বলিস্, মা। কিন্তু কাঁদতে পাবি না, ব'লে দিচ্ছি।"

এই রকম করে প্রথম ফাঁড়া উতরে গেলে, দেবারুর বিদ্যার্জ্জন যথা-রীতি আরম্ভ হল। লিখতে পড়তে সহজেই শিখে নিলে। ছেলের নিজের গরজ কি না ! বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেই মাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে শোনাতে সুরু করে দিলে। তার পর ঘরে নিত্য রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতে করতে পড়া বিদ্যাটা এত সহজে আয়ত্ত হয়ে গেল যে পণ্ডিত, সহপাঠী, সকলের তাক লেগে গেল। এ সব ত হল। কিন্তু দুরন্তপনা গেল না। ইস্কুলে যে কয় ঘণ্টা আটকে থাকত, অন্য সময় সুদসুদ্ধ সেটা উশুল করে নিত।

একটা না একটা ছেলের ঝোঁক লেগেই আছে। আর যখন যেটা ঝোঁক, সেটার হদ্দও করা চাই। পাখীর ছানা ত সকল ছেলেতেই ধরে। কিন্তু দেবারু যখন পাখীর বাচ্চা ধরতে আরম্ভ করলে তখন গাঁসুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। সারাদিনই দেবারুর দলের ছেলেরা গাঁয়ের গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ এদের ছেলে পড়ে গেছে, কাল ওদের

মেয়ের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, অমুকের ফল সুদ্ধ মস্ত ডাল ভেঙ্গে ভুঁইয়ে পড়েছে, এই রকম গোলযোগ লেগেই রয়েছে দিনের পর দিন। কত রকম রঙ্গ বেরঙ্গের খাঁচা তৈরী হয়েছে। ঘরের ভেতর, দাওয়ার উপর, উঠানে, সর্ব্বত্র খাঁচা ঝুলছে। যব, ছোলা, ছাতু, চিনা, কাওন, নিয়ে পাখীর খাবার তৈরী করতেই মালতীর অর্দ্ধেক বেলা কেটে যাচ্ছে। মাছ ধরতে যেতে পায় না। ছেলে বলে, "তা হলেই বা। নাই বা গেলি! শুধু ভাত, দাল, লঙ্কা খেতে দিস্।"

হেড পণ্ডিত মহাশয় খুব ধমকালেন ছোকরাকে একদিন, এই নিয়ে। সে উত্তর দিলে, "আমি কি পড়া বলতে পারি না, মশায়, যে এত বকছেন!"

পণ্ডিত চ'টে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মুখের উপর কথা বলছিস্, হতভাগা ছেলে! রোস্ তোর মাকে ব'লে আসছি।"

"মিছেমিছি আমার উপর রাগ করছেন কেন, মশায়? ব'লে আসুন না মাকে। আমি ত আর অন্যায় কিছু করি নেই। অন্যায় কাজ হলে মা কোন দিন করতে দিত না।"

সেই দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে মালতী ছেলেকে বললে "দেবারু, তুই নাকি পণ্ডিত মশায়ের মুখের উপর চোপা করেছিস্?"

"না মা, আমি মোটেই চোপা করি নেই। আমাকে পাখী পোষা নিয়ে মিছেমিছি বকাবকি করছিলেন। তাই আমি বলেছি, যে আমি কি পড়া তৈরী ক'রে আসি না যে আমার বাড়ীতেও খেলা করা বন্ধ করে

দিচ্ছেন? তাইতে উনি ভীষণ রেগে উঠলেন। আচ্ছা, তুই বল্ না মা, আমি বাড়ীতে কি করি না করি, তাতে পণ্ডিতের কি?"

"ছি বাবা, ও রকম বলতে নেই। উনি তোর গুরু, কত যত্ন ক'রে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। যা বলেন, তোর ভালর জন্যই ত বলেন।"

"তা বলুক গে। ইস্কুলে কতকগুলো ন্যাকা ছেলে আছে, তারা না পারে সাঁতার দিতে, না পারে গাছে চড়তে, না পারে দৌড় ঝাঁপ করতে। তাদের মতন আমি হতে চাই না! শুধু উল্লুকের মত দিবারাত্র পড়া আর পড়া! পণ্ডিত মশায় তাই চান। কিন্তু সে আমার দ্বারা হবে না।"

"আচ্ছা, আমি যদি বলি যে পাখীর ছানা আর ধরিস্ না?"

"তাহলে কালই সব ছানাগুলোকে ছেড়ে দেব। সে ত আমি পণ্ডিতকে বলেছি।"

"আচ্ছা, তাই দিস্, বাবা। পাখীর বাসা থেকে বাচ্চা চুরী করে আনা ত আর ভাল কাজ নয়! নাই বা করলি?"

দেবারু ছল ছল চোখে বললে, "তুই আগে বলিস্ নেই কেন? আমাকে অন্যায় কাজ করতে দিলিই বা কেন এত দিন?"

"তোর এত ঝোঁক হল পাখী পোষার দিকে, যে আমি তোর মনে কষ্ট দিতে পারি নেই, বাবা।" বলতে বলতে মার গলা ধরে এল।

সকালে উঠে দেবারু পাখীগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে, তার অত সাধের খাঁচা সব বিলিয়ে দিলে। মা বলে দিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়কে বলিস যে পাখী পোষা ছেড়ে দিয়েছিস্।"

"তা বলব, কিন্তু এ কথাও বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেব যে মা বলেছে তাই পাখীগুলো ছেড়ে দিয়েছি, নইলে দিতাম না।"

এ রকম ঘটনা যে এই একবার হয়েছিল, তা নয়। কিন্তু প্রতিবার পরিণাম একই রকম। ছেলে অন্যের কাছে বাঘ, কেবল মার কাছে পোষা বেরালটী। পড়াশুনো ভালই করছিল, তবে গণিত শাস্ত্রে বিদ্যা কিছুতেই এগোয় না। মা কিছু বললে উত্তর দিত, "অঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না, মা। আর শিখেই বা কি হবে? কি গুনব আমি, আকাশের তারা, না নদীর ঢেউ?"

ছেলের ইস্কুলের শেষ বছরে মালতী জ্বরে পড়ল। দু তিন দিন ঘর-কন্নার কাজ কোন রকমে করলে; কিন্তু এক দিন আর উঠতে পারলে না কিছুতেই। দেবারু ইস্কুল কামাই ক'রে মহা উৎসাহে রান্নাঘরের ভার-নিলে। কি রাঁধলে তা ভগবানই জানেন। তবে খেয়ে এসে মাকে বললে, "মা, আজ যা খিচুড়ী রেঁধেছিলাম! তোর গায়ে জ্বর না থাকলে, একটু খাইয়ে দিতাম। দেখতিস, ছেলে কি রকম লায়েক হয়েছে।"

"রান্না ত হল, বাবা! কিন্তু আজ ঠাকুর সেবার কি হবে সন্ধ্যাবেলায়?"

"তুই শিখিয়ে দিলেই করতে পারব। তোর কোন ভাবনা নেই।"

সূর্য্য ডুবলে তুলসীতলায়, ঘরে, সন্ধ্যা দিয়ে দেবারু ঠাকুর-পূজার জন্য প্রস্তুত হয়ে এল। মাকে বললে, "এইবার একটু ব'লে দে দেখি, কি কি করতে হবে।"

মা একটু হেসে উত্তর দিলে, "একটা নূতন বই আনিয়েছি। পেটরা খুলে বার কর ত।"

ছেলে পেটরা থেকে বার করে আনলে একখানা চকচকে নূতন

মহাজন পদাবলী। মালতী বললে "পূজা ত অনেক রকমের হয়ে থাকে তুই এক কাজ কর। গোবিন্দের সামনে প্রদীপটা রেখে বইখানা পড়তে আরম্ভ কর। বেশ ভক্তি ক'রে পড়বি, যেন ঠাকুর শুনছেন। দেখ দেখিনি, পড়তে পারিস কি না।"

দেবারু আসন পীঁড়ি হয়ে ব'সে বই পড়তে আরম্ভ করলে, "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।"

একবার পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, সুর ক'রে পড়ব ?"

"বেশ ত, পারবি ?"

"খুব পারব, মা। ও সুর আমার জানা আছে। দু তিন বার শুনেছি।"

দেবারু তখন দেবতার সামনে জোড় হাত করে হাঁটু গেড়ে বসল। বসে বললে, "ঠাকুর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমার মাকে শীগ্‌গীর ভাল ক'রে দাও। আর, আমার মা যেন কোন দিন দুঃখ না পায়। "ব'লে সুর ক'রে পড়তে আরম্ভ করলে চণ্ডীদাসের পদাবলী। একটু পাঠ ক'রে, তার পর চোখ বুজে গান ধরলে, "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে গাইলে।

মালতী ছেলের মুখের পানে চেয়ে নিশ্চল পাথরের মত বসে রইল। এ কার স্বর ? কে গাইছে ? কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যে আকুল করে দিচ্ছে! গানের আওয়াজে পাড়ার মেয়েরা একজন একজন ক'রে কখন এসে নিঃশব্দে বাহিরের দাওয়ায় বসেছে। তারাও অবাক হয়ে গেছে। কে গায় ? মালতীর খোকা!

পূজা শেষ হলে, দেবারু ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে, মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে, বেরিয়ে গেল একটীও কথা না কয়ে। তার মন প্রাণ যেন কিসে ভ'রে উঠেছে। সমস্ত গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এক প্রহর রাত অবধি চুপ করে নদীর ধারে বসে রইল।

এক দিন বিশ্রাম পেয়ে মালতী অনেকটা ভাল বোধ করতে লাগল। জ্বর ছেড়ে গেছে, কিন্তু আজও বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে। দেবারু শুয়ে থাকতে বললে, উঠতে দিলে না। পাড়ায় শম্ভু ব'লে একটী অনাথ দুলের ছেলে ছিল। সে দেবারু দাদার একান্ত অনুগত। তাকে ডেকে এনে ঘর দোরের সমস্ত কাজ করলে। ভাত রাঁধলে, বাসন মাজলে। আজও ইস্কুল কামাই হল। সেদিন ইচ্ছা করলে মালতী সন্ধ্যাবেলা পূজা করতে পারত। কিন্তু বড় লোভ হল ছেলের গলার সেই মিঠে গান আবার শুনতে, ছেলের সেই তন্ময় ভাবের পূজা দেখতে। পূজা আগের দিনের মতনই হল। কিন্তু গান আজ আরও সুন্দর জমল। প্রথম থেকেই গলা খুলে গেল। ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে কি না, তাই দেবারুর আজ সঙ্কোচ কেটে গেছে। যেন আপনার জনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইছে। পাড়ার মেয়েরা আজ প্রথম তানের সঙ্গে এসে পৌছেছে। পূজা হয়ে গেলে সবাই বলতে লাগল, "ধন্যি গর্ভ তোর, মা! পেট থেকে পড়েই ছেলে এমন পূজা করতে শিখেছে।"

মালতী কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছে, "কই, আমার ত এমন পূজা হয় না। আমার পূজার মাঝে কে যেন এসে দাঁড়ায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বংশীধারী, আমার উপর দয়া কর।"

তৃতীয় দিনে মালতী ভোরে উঠে মাছ ধরতে গেল। যাওয়ার সময় ছেলেকে বলে গেল "আজ আর ইস্কুল কামাই করিস না, বাবা। আমি বেশ ভাল আছি।"

নদীর ধারে হেড পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে মালতীর দেখা হল। তিনি খুব চড়া মেজাজে বললেন, "দেখ মালতী, তোমার খাতিরে আমি তোমার ছেলেকে অনুগ্রহ ক'রে ইস্কুলে নিয়েছি। নইলে আমার ইস্কুলে ছোট জাতের ছেলে ভর্ত্তি করি না। দেবারুর নানা রকম উপদ্রব আমি সয়ে এসেছি এত দিন, কেবল এই কারণে যে সে মেধাবী ছেলে। কিন্তু আর সহ্য করব না। আজ তিন দিন হতে ইস্কুলে আসে নেই, কোথায় ইয়ারকী দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

মালতীর অত্যন্ত রাগ হল। সে বরাবর এই পণ্ডিতকে নানা রকম মাছ, তরী তরকারী ভেট দিয়ে এসেছে। গেল বছর তার গিন্নীকে একটা ভাল কাঁথা সেলাই ক'রে দিয়েছে। আজ সে এই সব কথা বলছে! মুখ খুললেই কিছু কড়া কথা বেরিয়ে যাবে। চুপ করে থাকাই ভাল। এই ভেবে মালতী প্রণাম করে নীরবে নজের কাজে চলে গেল।

দেবারু ইস্কুলে পৌঁছতেই তার হেড পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে তলব পড়ল। তিনি রক্ত চক্ষু ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "দুলে বাবুর যে তিন দিন ইস্কুলে আসা হয় নেই!"

"মশাই, আমার মায়ের বড় অসুখ করেছিল, তাই ঘরের কাজ কর্ম্ম দেখতে হয়েছিল।"

"আবার মিছে কথা বলছিস্! তোর মা ত দিব্যি রয়েছে। এই

নদীর ধারে দেখে এলাম। বল্, কোন্ চুলোয় গেছলি এ তিন দিন!"

"মশাই, আমি মিছে কথা বলি না। কাউকে ভয়ও করি না। মায়ের অসুখ করে, আবার ইস্কুল কামাই করব।"

"বড্ড যে আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোর! লম্বা লম্বা কথা শোনাচ্ছিস্। কথায় ত বলে, নাই দিলে কুকুর মাথায় চড়ে। ছোটলোকের ছেলে আমার নেওয়াই ভুল হয়েছিল।"

"মশাই তাড়িয়ে দিতে হয়, তাড়িয়ে দেবেন। ছোটলোক ছোটলোক করবেন না, খবরদার!"

পণ্ডিত রাগে অধীর হয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, "হারামজাদা, বেজন্মা! বাপের ঠিক নেই। বেরো ইস্কুল থেকে। দূর হয়ে যা, বলছি।

"তা যাচ্ছি, বিটলে বামুন! কিন্তু তুমি আমার মাকে গালাগাল দিয়েছ, এর শোধ আমি নেব, ভাল করেই নেব। একদিন তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব যখন তুমি ঘুমোচ্ছ। বুঝলে? মনে রেখো।" ব'লে বই, শ্লেট, দোয়াত, কলম, সব পণ্ডিত মহাশয়ের বুকের উপর ছুঁড়ে মেরে দেবারু ছুটে বেরিয়ে গেল। ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হল।

—পাঁচ—

এ দিক্ ও দিক্ ঘুরে ফিরে যখন দেবারু বাড়ী পৌছল, তার মা উঠানে গাছতলায় বসে সেলাই করছে। ছেলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে মার কোলে মাথা লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে, আদর করে, কোন রকমে ছেলেকে শান্ত করলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, বাবা? অমন ক'রে কেঁদে উঠলি কেন?"

"মা, ইস্কুলের ঐ হারামজাদা বামুনটা তোকে খারাপ কথা বলেছে। আমি তাকে বেশ করে শাসিয়ে এসেছি যে তার ঘরসুদ্ধ তাকে একদিন পোড়াব। সত্যিই পোড়াব। নইলে আমি গাঁয়ে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?" বই, দোয়াত, হাতে যা ছিল সব পণ্ডিতের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। আমার বিদ্যা শিক্ষা খতম হয়ে গেল। আর ইস্কুল যেতে বলিস্ না। কি হবে দুলের ছেলের লেখাপড়া শিখে?"

"দুলের ছেলে" শুনে মালতীর জিবের ডগায় যেন কি কথা এল, কিন্তু চেপে গেল। খুব গম্ভীর হয়ে ছেলেকে বললে, "না বাবা, তোকে আর পড়তে যেতে হবে না। গরীবের কেউ নেই রে এ দুনিয়ায় এক ভগবান বই।"

"তুই দুঃখ করিস্ না, মা। যা শিখেছি, তাতে তোকে রামায়ণ মহাভারতও শোনাতে পারব, ঠাকুরের কাছে পদাবলীও পড়তে পারব।

কিন্তু, মা! তোর গোবিন্দ কি বলেছেন যে মুখ বুজে সব অত্যাচার সয়ে যেতে হবে?"

এ কথার মালতী কিছু উত্তর দিলে না! হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালে। মনে মনে বললে, "ঠাকুর, তোমার যা ইচ্ছা, আমার ছেলেকে দিয়ে তাই করিও।"

সন্ধ্যাবেলা মালতী ছেলেকে কাছে বসিয়ে তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা সব বুঝিয়ে দিলে। কাঁথা বিক্রী ক'রে কিছু টাকা সঞ্চয় হয়েছিল। আরও কিছু জমা হলে একটু জমী কিনে তরী তরকারীর চাষ করবে। রোজ মাছ ধ'রে গ্রামে বেচে, আর রবিবারের হাটে বাগানের তরকারী বেচে, তাদের সংসার বেশ চলে যাবে। সেলাইয়ের আয়টা জমতে থাকবে, তাতে হাত দেওয়ার দরকার হবে না মালতী গাঁয়ে গরীবের ঘরে কিছু কিছু ঔষধ-পত্র জোগায়। আয় বাড়লে আরও ঔষধ রাখতে পারবে। দেবারু এই সব শুনে বললে, "দেখ্ দেখিনি মা, আমাকে মিছেমিছি তুই পাঁচ বছর ইস্কুলে রাখলি! এত দিন চাষ বাস শিখলে কাজে লাগত।"

"তোর কি চাষ-বাস শেখার বয়স উতরে গেছে নাকি? এই ত তোর বারো বছর পূর্ণ হল। এখনই বা তুই কি চাষের কাজ করতে পারবি?"

"সব পারব, মা। বারো বছর কি কম বয়স নাকি! ইস্কুলের কেতাবে পড়েছি যে এই বয়সে কত ছেলে যুদ্ধ জিতেছে, বড় বড় রাজত্ব চালিয়েছে। তোর ছেলেও কি তাদের কার চেয়ে কম! কাল থেকে তোর মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ। আমি ডিঙ্গী ক'রে মাছ ধরতে যাব, তুই

ঘরে থাকবি। আচ্ছা মা, শম্ভুকে আমাদের বাড়ীতে রাখলে হয় না? তার কেউ নেই। বেচারার বড় দুঃখে কষ্টে দিন যায়।"

"আচ্ছা, আমি শম্ভুকে কাল থেকে এখানে থাকতে নিয়ে আসব। কিন্তু ডিঙ্গীতে মাছ ধরতে তোর বেরোন হবে না, এ কথা স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি। এখনও কিছুদিন আমার সঙ্গে খালে বিলে ঘুরে মাছ ধরবি।"

দেবারু ছেলেটীকে একটু জ্যাঠা ব'লে কি পাঠকের মনে হচ্ছে? আমারও মনে হয় যেন একটু ইঁচড়ে পাকা। তবে বেচারাকে শান্ত শিষ্ট হতে শেখালে কে?

সীতানাথ সরকার এখনও ভুলুয়ায় নায়েব। দেবারু ইস্কুল ছাড়ার পরদিন এসে তিনি মালতী ও দেবারুকে খুব ধমকে দিলেন, "এ কি রকম কথা, দেবারু? পণ্ডিতের গায়ে কালী ঢেলে দিলি, তাকে পুড়িয়ে মারবি বলে শাসিয়ে এলি। একি মগের মুল্লুক না কি?"

দেবারু বললে, "নায়েব বাবু, আমার এখন রাগ প'ড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি যে অন্যায় করেছি। কিন্তু পণ্ডিত আমার মাকে কি বলেছে সে কথার কি কোন বিচার হবে না? আমার মাকে ঐ সব কথা বলে এখনও হতভাগা বেঁচে আছে! তুমি এ গাঁয়ের হাকীম তুমিও কিছু বলবে না! মগের মুল্লুক ছাড়া কি বলব একে?" দেবারু কথা কইতে কইতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

মালতী হাত জোড় ক'রে বললে, "ওকে নিয়ে যাও, দাদা। পণ্ডিত মশায়ের পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে আসবে। যা, দেবারু।"

নায়েব বাবু দেবারুর পিঠে হাত রেখে বললেন, "তুই আয় আমার

সঙ্গে, পণ্ডিতকেও খুব ব'কে দেব তোর মায়ের কথা বলেছে ব'লে। তাহলেই ত ন্যায় বিচার হবে!"

দেবারু পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ে ধরতে তিনি মুখে তাকে মাপ করলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বললেন, "এ গাঁয়ে আর থাকা নয়। এ যে দস্যি ছেলে, ঠিক ঘর জ্বালিয়ে দেবে।"

মালতী নায়েব বাবুকে তাদের ঘর কন্নার সব ব্যবস্থা জানালে, আর ব'লে রাখলে যে টাকা কড়ির একটু সুবিধা হলেই জমীদারের কাছ থেকে এক টুকরো চাষের জমী প্রার্থনা করবে।

নায়েব বললেন, "দেবারুকে যখন নিতান্তই আর পড়াবি না, তখন আমি দরকার হলেই তোদিকে একটু জমী সুবিধা দরে দেব।"

এই কথাবার্ত্তার মাসখানেক পরে, সীতানাথ রায়নগরের বৃদ্ধ হরিচরণের কাছ থেকে এই পত্র পেলে।

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ মঙ্গল বিশেষ।

সীতানাথ ভায়া, তোমার পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। রাণী মাতাকে মালতী ও তাহার পুত্রের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছি। তুমি দেবারুর ইস্কুলে পড়া সম্বন্ধে আর পীড়াপীড়ি করিও না। বরং তাহাদিগকে কিছু চাষের জমীর সুবিধা মত দিও। জমীর সেলামী আমাদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে।

রাণীমাতা তোমার বেতন বৃদ্ধির জন্য তোমার বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আশা করি সে অনুরোধ নিষ্ফল হয় নাই।

আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর কাজ কর্ম্ম করিতে পারি না। রাজাবাবু আমাকে বৃন্দাবনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও করিব। সেখানকার রাজ-বাটীর তত্ত্বাবধানও করিব শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর ও মহারাণী মাতার কাল হওয়া অবধি সেখানকার সম্পত্তি দেখা-শুনার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এখানে রায়নগরে নূতন দেওয়ান আসিয়াছেন। হাল ফেশনের লোক। আমাদের সহিত বনি-বনাও হওয়া কঠিন। রাজাবাবু ত নিজে আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। নূতন দেওয়ান আমাদের কদর কি বুঝিবে! এই বেলা মানে মানে বিদায় হওয়াই ভাল।

এক একবার ইচ্ছা করিতেছে, পশ্চিম যাওয়ার পূর্ব্বে তোমাদের গ্রামে গিয়া মালতীকে দেখিয়া আসি। কিন্তু সাহস হয় না। সে আমাদিগকে কি ভাবে দেখিবে জানি না। আমরা তাহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, আমাদের মমতা পূর্ব্ববৎই আছে। তোমরা বৌদিদি এখনও মালতীর নাম করিয়া চক্ষের জল ফেলেন। আমি চলিয়া গেলেও তুমি ইহাদের ত্যাগ করিও না।

ইহাদের সম্বন্ধে রাণীমাতাকে কিছু জানাইতে হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সাধুচরণকে পত্র লিখিও। সেই খামারের কার্য্যে বহাল হইল।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী হরিচরণ সরকার

পুনশ্চ। মালতী সম্বন্ধে আমি যদি কিছু অন্যায় কখনও করিয়া থাকি ত সে জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে পশ্চাত্তাপ আসিয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কখনও যদি সুযোগ হয় ত মালতীকে এ কথা বলিও। কিন্তু সে হয় ত বুঝিবে না।"

—ছয়—

দেবারুর নূতন ধারায় জীবন যাত্রা সুরু হয়েছে। ইস্কুল ছাড়ার দু বছর বাদে তার মা তাকে এক ডিঙ্গী কিনে দিয়েছে। বিঘে দুই জমীও কেনা হয়েছে বাড়ীর কাছেই, তরকারী বাগানের জন্য। বাগানের ভার আছে শম্ভু ও মালতীর হাতে। মাছ ধরার কাজ গেছে দেবারুর হাতে। সে এখন ধবলা ছেড়ে বড় নদীতেও মাছ ধরতে যায়। তার সারা বিকেলটা কেটে যায় জাল ডিঙ্গী মেরামতের কাজে। ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, দুপুর নাগাদ ফেরে। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। সে দিন আগে থাকতে মায়ের অনুমতি নিয়ে বেরোয়। মা অনুমতি দেন বটে, কিন্তু ছেলে ফেরা পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করেন না।

মাছ ধরার আয় যখন খুব বেড়ে গেল, তখন একটা বড় ডিঙ্গী কেনা হল। সে ডিঙ্গীতে পাল খাটান যেত। এই নূতন নৌকা পেয়ে দেবারুর মাছ ধরার নেশা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ডিঙ্গীতে শুধু জাল নয়, ছিপও নিয়ে যেত। এক একদিন খুব বড় বড় মাছ আনত। ভুলুয়ার লোকে আর কত মাছ কিনবে, তাই মাছ অন্য গ্রামেও বেচে আসতে হত। যখন এই ব্যবসা খুব জোর চলছে, তখন একদিন হল কি? দেবারু শনিবার ভোরে বেরিয়ে রবিবারেও ফিরল না। শম্ভু অনেক চেষ্টা করলে মালতীকে ভাত খাওয়াতে, কিন্তু সে কিছুতেই খেলে না। রবিবার সন্ধ্যার সময় একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খেলে। সোমবার দিন সকালে এত দুর্ব্বল বোধ হতে লাগল যে বিছানায় পড়ে রইল। বেলা বারোটার

সময় নদীর ঘাটে দেবারুর চীৎকার শোনা গেল, "মা গো, আমি এসেছি। কত মাছ এনেছি দেখে যা।"

মালতী উঠতে চেষ্টা করলে, পারলে না। শম্ভুকে পাঠিয়ে দিলে ঘাটে। দেবারু এসে মাকে শুয়ে থাকতে দেখে ধপ্ ক'রে ভুঁইয়ে ব'সে পড়ল, গালে হাত দিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে তোর, মা? অমন করে পড়ে রয়েছিস কেন? অসুখ করেছে?"

মালতী ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলে, "কিছু নয়, বাবা। তুই দু দিন ঘরে ছিলি না কি না তাই বড় মন কেমন করছিল। এখন তুই এসেছিস্, ভাল হয়ে যাব। কিন্তু বাবা, আর আমাকে ছেড়ে অতক্ষণ থাকিস্ না। কোন্ দিন এসে দেখবি, মায়ের হয়ে গেছে।"

শম্ভু সকাল থেকে রাগে ফুলছিল। সে একটু জোরেই ব'লে উঠল, "মানুষের শরীর ত, না খেয়ে কি আর থাকে! দাদা, তুই এমনই মূর্খ! বুঝতে পাচ্ছিস না, মাসী অনাহারে প্রাণটা দিচ্ছিল। তিন দিন কিছু খায় নেই। নে, স্নান ক'রে আয়। পান্তা ভাত আছে, দই আছে, মাসীকে চারটী খাওয়া আগে। তারপর দুজনে খাব।"

দেবারু ধীরে ধীরে উঠল। উঠে জাল ছিপ সব একত্র করে উনানে ফেলে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর মার পায়ে হাত দিয়ে বললে, "মা, আমি এমনই হতভাগা ছেলে তোর, তোকে তিন দিন উপোসী রাখলাম। সব আপদ চুকিয়ে দিয়েছি। আর মাছ ধরতে কক্ষণও যাব না। আমাকে মাপ কর। নে ওঠ্, চারটী পান্তা ভাত খাবি চল্।"

মালতী হেসে ছেলের মাথায় হাত রেখে উত্তর দিলে, "পাগল ছেলে! আমাকে কি কেউ ধ'রে রেখেছিল? খেলেই ত পারতাম।"

এর পর, মাছ ধরার ব্যবস্থা আবার আগের মত হল। অর্থাৎ মালতী সকালবেলা, যা পারে, চুনো পুঁটী ধ'রে এনে গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী বেচে আসে। দেবারু আর শম্ভু চাষবাস দেখে। মালতী তাদের দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। কিছুদিন এই ভাবে সংসার বেশ চলল। কিন্তু দেবারুর মত ছটফটে ছেলের এই সামান্য কাজ নিয়ে দিন কাটান কঠিন। এক দিন সে মালতীকে বললে, "মা, এই ত সামান্য একটুকু জমী। এই নিয়ে আমাদের দুজনের সময় নষ্ট করা কি উচিত? আমি আর একটা কিছু করার চেষ্টা দেখি।"

মা বললে, "এই ত তুই সবে পনের বছরের হয়েছিস্। কি কাজ করতে পারবি তুই? অবশ্য আমাকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চাস্, ত আলাদা কথা।"

"ছি মা, ও কথা বলিস্ না। আমি তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? তবে আমার দুঃখ এই, তুই কিছুতে বুঝতে চাস্ না যে তোর ছেলে বড় হয়েছে। আমি একটু একটু লাঠি খেলি, জানিস্ ত? আমায় ওস্তাদ, ফকীর সরদার, বলে যে আমার খুব চমৎকার হাত, চেষ্টা করলে বড় খেলোয়াড় হতে পারব। তুই যদি হুকুম দিস্ ত ও বিদ্যাটা ভাল করে শিখি।"

"লেঠেল হবি? তাতে ভাল কি হবে, তা ত বুঝি না। ফকীরটার নাম অত্যন্ত খারাপ। একবার ডাকাতীর জন্য ধরাও পড়েছিল। তোকে তার দলে টানবার চেষ্টা করছে বই ত নয়!"

"আমি তোকে বলছি, মা, ডাকাতী আমি কোন দিন করব না। টাকার আমাদের অভাব নেই, পরের টাকা কেন কেড়ে নিতে যাব? বরং ভাল ক'রে লাঠি ধরতে শিখলে, গাঁয়ের চৌকীদার হতে পারব। দেখব যে ডাকাত ভুলুয়ার চৌহদ্দীর ভেতর কখনও পা দিতে না পারে।"

মালতী ঠিক রাজী হল, তা নয়। তবে ছেলের এত ঝোঁক দেখে তখনকার মত চুপ করে গেল।

ফকীর লোকটা সত্যি ভাল নয়। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর চেহারা, কিন্তু চরিত্র কদর্য্য। অল্প বয়সে এক চাঁড়ালের মেয়েকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছিল। এত দিন বিদেশেই থাকত। শোনা যায়, দুই একবার জেলও খেটেছে। মাত্র বছর দুই হল গাঁয়ে ফিরেছে। ফেরবার পরেই একবার ডাকাতী মোকদ্দমায় ধরা পড়েছিল, প্রমাণ না থাকায় ছাড়া পায়। সেই থেকে বাউরী কাটা চুল সযতনে আঁচড়ে, রঙীন গামছা কাঁধে ফেলে, গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। জমী-জেরাৎ নেই, কাজ ধান্দাও নেই, কি ক'রে দিন চলে কেউ জানে না। পৈতৃক ভিটের এক কুঁড়ে ঘর বেঁধেছে, একা সেইখানে বাস করে। বাপ মা অনেক দিন মরেছে, ভাই বোন কেউ নেই, বিয়ে-থাও করে নেই। দেবারুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল বড় নদীর উপর। একদিন দেবারুর ডিঙ্গী এক ভীষণ ঘুরণীপাকে পড়েছিল, কিছুতেই বেরোতে পারছিল না। এমন সময় এক কাছের চর হতে সাড়া এল, "সাবাস্ জোয়ান, আর একটু খ'ঠে চালা, এলাম ব'লে।"

দেখতে দেখতে এক বড় ডিঙ্গীতে ফকীর আর তিন চার জন লোক এসে উপস্থিত হল। তারা দূর থেকে, এক কাছি ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে

বললে, "তোর ডিঙীর সঙ্গে বেশ ক'রে বাঁধ্।" বাঁধা হ'লে, "বদর, বদর," ব'লে চারজন এক সঙ্গে সজোরে বঠে ঠেলে দুখানা ডিঙীকেই ঘুরনী থেকে বের করে নিয়ে এল।

ফকীর দেবারুর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে সঙ্গীদের বললে, "খাসা ছেলেটা! কি ছাতি, কি হাতের গুলি! বড় হলে বেশ জোয়ান হবে।" দেবারুকে জিজ্ঞাসা করলে, "লাঠি সোটা খেলতে জানিস্? শিখবি খেলা? আমি ফকীর সরদার, নাম শুনেছিস্ ত? আমি তোর ওস্তাদ হব।"

"মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমাকে বলব, সরদার।"

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই দেবারুর মাছ ধরা বন্ধ হয়ে গেল। কি হয়েছিল, তা আগেই বলেছি। মালতী প্রথম প্রথম ফকীরকে আদর যত্ন করত, সে ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিল ব'লে। কিন্তু যখন খোজ খবর নিয়ে জানলে সে কি রকম লোক, তখন তাকে দূরে রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ছেলে ফকীরের এমন অনুগত হয়ে পড়ল, যে তাকে ছেঁটে ফেলা অসম্ভব হল। লোকটার ধরণ ধারণও যেন কেমন কেমন। সকালবেলা মালতী যখন মাছ ধরতে বের হয়, তখন একটা না একটা ছুতো ক'রে ফকীর তার সঙ্গে এসে জোটে। এক একদিন দেবারুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসে, এসে দাওয়ায় বসে নানা গল্প জুড়ে দেয়। গল্প এমন চমৎকার করতে পারত যে দেবারু শম্ভু এক মনে বসে শুনত, খাওয়া দাওয়া ভুলে যেত। মালতী যেখানে এলে তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে হেসে বলত, "তুমিও বস না গো, মালতী। তাহলে খুব গল্প জমবে।"

এই রকম ভাবে দিন যাচ্ছিল। দেবারুর লাঠি খেলায় আশ্চর্য্য

রকম উন্নতি হতে লাগল। ফকীর তাকে বলত, "এমন সাকরেদ কখন পাই নেই রে! তোকে শিখিয়ে সুখ আছে। আমার বিদ্যের ঝুড়ী খালী ক'রে তোকে দেব।"

গাঁয়ের লোক কেবলই বলত, "যে রকম দেখছি বাবা, সাকরেদ কোন দিন ওস্তাদকে হারাবে।"

মালতীর অস্বস্তি কিন্তু বেড়ে চলেছিল। ওস্তাদকে নিয়ে ছেলে এমনই মেতেছে যে কোন কথা বলবার জো নেই। এ দিকে ফকীর মালতীর সঙ্গে ভাব করার কোন ছুতোই ছাড়ে না। তাকে তাকে ফেরে, সুবিধা পেলেই নির্লজ্জ ভাবে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে। নানা ছেঁদো কথায় খোশামোদ করে। একদিন বললে, "অনেক দেশ ঘুরেছি, মালতী। কত রকমের মেয়ে মানুষ দেখেছি। কিন্তু তোমার মত সুন্দর মুখ কখন নজরে পড়ে নেই।"

আর একদিন বললে, "কি যাদু জান তুমি, মালতী? তোমাকে দেখলে কে বলবে ভাই, সতের বছরের ছেলের মা। পঁচিশ বছর বয়সেই অমন দেহের বাঁধন কটা মেয়ের থাকে!"

মালতী বিব্রত হয়ে উঠল। ঐ টুকু ছেলে, তাকেই বা কি বলবে? আর তার রক্ষক কে আছে! এক নায়েব বাবু আছেন, তা লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁকে এ সব কথা বলতে পারবে না। রাত্রের অন্ধকারে এক এক দিন উঠে, তার ঠাকুরকে সব দুঃখ জানায়, আর বলে, "গোবিন্দ, তুমিও আমাকে ভুললে! আমাকে উদ্ধার করবে না তুমি?"

গোবিন্দ, বোধ হয়, ডাক শুনলেন। কেন না, একদিন সন্ধ্যার পর

এক প্রহর রাতে দেবারু ঝড়ের মতন এসে মায়ের হাত ধ'রে বললে, "মা, ওস্তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তুই ঠিক ধরেছিলি। লোকটা সত্যি ডাকাতী করে। অন্ধকার হতেই আজ আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তার ঘরে। সেখানে আরও কজন জোয়ান জোয়ান মানুষ বসেছিল। তারা কোথায় এক দোকান লুটতে যাবে ঠিক করেছে। আমাকে বললে, সঙ্গে যেতে হবে। আমি হ্যাঁ, না, কিছুই বললাম না। তারা আমাকে কত বোঝালে, কত রকম লোভ দেখালে। শেষ, আমার বড্ড রাগ হল। বলে ফেললাম,—খবরদার, আমাকে কিছু বোলো না তোমরা, আমি নায়েব বাবুকে ব'লে দেব, থানায় খবর দিয়ে আসব।

ওস্তাদ ঠাট্টা ক'রে বললে,—এত কষ্ট ক'রে তোকে লাঠি ধরতে শেখালাম কি এই জন্য। কাজের সময় লেজ গুটিয়ে পালাবি ব'লে? আমি কোনও উত্তর না দিয়ে চলে এলাম।"

মালতী ভয়ে কাঁপছিল। বললে, "একেবারে ঝগড়া ক'রে এলি! ছেলে মানুষ তুই, যদি তারা মারধর করে!"

দেবারু দাঁড়িয়ে উঠে বুক ফুলিয়ে জবাব দিলে, "মারলেই হল আর কি! আমি ত মারতে জানি না!"

"তা হোক গে, বাবা। তুই সাবধানে থাকিস্। অন্ধকারে বাহিরে যাস্ না। দুষ্ট লোক ওরা।"

—সাত—

সকাল উঠে কিন্তু মালতী ছেলেকে বললে, "বাবা, আমার কিছুতেই সোয়াস্তি হচ্ছে না। চল্, তোকে নায়েব বাবুর কাছে নিয়ে যাই। তাঁকে সব কথা শুনিয়ে রাখা ভাল।"

সীতানাথ সব কথা শুনে মালতীকে আশ্বাস দিলেন, "তুমি ভয় পেও না, মালতী। ওরা তোমার ছেলের উপর কোন জুলুম করতে সাহস পাবে না। ফকীরের উপর থানাদারের কড়া নজর আছে। দোকান লুটতে গেলেই ধরা পড়বে। আমার মনে হয়, একটা কাজ করলে তোমরা আরও নিশ্চিন্ত হতে পার। এ গাঁয়ে একটা চৌকীদারের চাকরী খালী আছে। তোমার ছেলেকে সে চাকরী আমি দেওয়াতে পারি। তাহলে ওর পেছনে জমীদার, পুলিশ, হাকীম সবাই থাকবে। কার সাধ্য ওর গায়ে হাত তোলে! চৌকীদারী করবি, দেবারু?"

দেবারু মহা উৎসাহে রাজী হল, "মাকে ত আমি কতবার বলেছি যে আমার লাঠি-খেলা শেখা চোর ডাকাত তাড়াবার জন্য। আমাকে চৌকীদার করে দেন নায়েব বাবু। দেখি, কোন ডাকাতের এত বড় বুকের পাটা, যে এ গাঁ লুটতে আসে।"

মালতীর প্রাণে ভয় হচ্ছিল যে ছেলে পুলিশে চাকরী নিলে যত চোর ডাকাত তাদের পেছনে লাগবে। তবে সে কোন আপত্তি করলে না নায়েববাবুর মানসে। ফিরে যাওয়ার পথে ছেলেকে তার ভয়েরকথ বললে।

ছেলে লাফিয়ে উঠল, "মা, তুই যেন কি ? এত বড় হলাম, আর কত দিন তুই আমাকে আঁচল ঢাকা দিয়ে রাখবি ? জানিস্ মা, তোর ছেলে লাঠি নিয়ে দাঁড়ালে তার সামনে হতে পারে এ রকম লোক এ তল্লাটে কেউ নেই, এক ওস্তাদ ছাড়া !"

যথা সময় দেবারু চৌকীদার হল। চাপরাস বেঁধে যে দিন প্রথম রাস্তায় বের হল, ফকীর এসে তাকে সেলাম করলে, "সেলাম, চৌকীদার সাহেব। খুব চোর ডাকাত ধর, তোমার পদবৃদ্ধি হোক্, কিন্তু, খবরদার ফকীর সর্দ্দারের সঙ্গে লাগতে যেও না।"

দেবারু খুব শান্তভাবে জবাব দিলে, "ওস্তাদ, মিছেমিছি আমাকে ভয় দেখাতে এস না। তোমাকে একটু সাবধান করে দিই। দারোগা তোমার গুণের কথা সব জানেন। তোমদের সেদিনকার লুটের পরামর্শের কথা আমি ফাঁস করি নেই, করবও না। কিন্তু এখন থেকে যা চোখে দেখব, কানে শুনব, সব থানায় রিপোর্ট করব। আমার নিজের জন্যই এটা করতে হবে। তোমার সাকরেদ ছিলাম ব'লে দারোগা আমাকে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না।"

ওস্তাদ একটু চুপ ক'রে রইল। তার পর দুপাটি দাঁত বের করে, হাসতে হাসতে বললে, "তা বেশ, সাকরেদ। তোর নিজের কদর খুব বাড়াগে যা। কিন্তু আমার এ আপসোস মলেও যাবে না, যে তোর মতন সোনার চাঁদ ছেলে শেষে লাল পাগড়ী বাঁধলে !"

——o——

—আট—

কয়েক মাস বেশ কেটে গেল। ফকীর গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে, তাই এরা সে দিকে কতকটা নিশ্চিন্ত আছে। দেবাক্রুর উপর দারোগা, নায়েব খুব সন্তুষ্ট। একে বলিষ্ঠ চটপটে ছেলে, তায় লেখাপড়া জানে, তাকে যে কাজে পাঠান যায় তা সহজেই হাসিল ক'রে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে থানায় রিপোর্ট করতে যেতে হয়, নইলে তার কাজ প্রধানতঃ গ্রামের মধ্যেই। তাই আগের মত চাষ-বাস দেখতে পারে। মালতী তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মনটা তার ভাল নেই। কি হয়েছে নিজেই বুঝতে পারে না: ছেলে দেখে, মা সদা সর্ব্বদা আনমনা হয়ে রয়েছে। কখনও চুপ করে গালে হাত দিয়ে উঠানে তুলসীতলায় বসে আছে, কখনও বা ঘরের ভেতর গোবিন্দের মুখের পানে চেয়ে রয়েছে, দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। রাত্রে এক একদিন ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "ঠাকুর, আমাকে ছেড়ো না।"

দেবাক্রু কেবলই জিজ্ঞাসা ক'রে, "মা বল্‌না, তোর কি হয়েছে?"

"কিছুই না, বাবা। শুধু শুধু কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়।"

"আমার জন্য তুই ভয় পাস? চৌকীদারী ছেড়ে দেব?"

"না বাবা, না। সে ভাবনা আমার চলে গেছে। বরং প্রাণে একটু ভরসা হয়েছে। মনে হয়, এখন তুই হাকীমদের আশ্রয়ে আছিস্, ফকীর তোর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।"

মায়ের মন ভাল রাখবার জন্য, দেবাক্রু সন্ধ্যাবেলা একটু সময় করে

নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে, নয় ত ঠাকুরের সামনে পদাবলী গান করে। নায়েববাবু এক একদিন শুনতে আসেন। একদিন যাবার সময় বলে গেলেন, "বেঁচে থাক্ তোর ছেলে, মালতী। কিন্তু লাঠি খেলাটা ছাড়িস্ না দেবারু। যতদিন পুলিসে চাকরী করবি, ঐ লাঠিই তোর গোবিন্দ।"

"না নায়েব বাবু, লাঠি খেলা ছাড়ব কি! একবার ডাকাত এলে হয় এ গাঁয়ে! গোবিন্দের কৃপায়, যত বড় দলই আসুক, আমরা তাদের হটিয়ে দিতে পারব।"

এই রকমে দিন যাচ্ছে। একদিন খবর পাওয়া গেল যে কোশ তিনেক দূরে এক গাঁয়ে খুব বড় খুনী ডাকাতী হয়েছে। দারোগা সাহেব ভুলুয়া দিয়ে যাওয়ার সময় দেবারুকে ডেকে বললেন, "চৌকীদার, যত দূর পাত্তা পেয়েছি এ তোর ওস্তাদজীর কাজ। তোকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। ফকীরের দলের লোককে, দরকার হলে, সনাক্ত করতে পারে এ রকম লোক আমার সঙ্গে থাকা চাই। তুই তাদের কাউকে কাউকে চিনিস্ ত!"

"হ্যাঁ হুজুর দু পাঁচজনকে দেখেছি।"

"আচ্ছা, তাহলে তোর বাড়ীতে বলে আয় যে হয় ত আজ রাত্রে ফিরতে পারবি না। কাল সকাল তোকে একবার ছুটী দেব, এসে ঘর দোর দেখে যাবি।"

দেবারু মার সঙ্গে দেখা করে বলে এল, "মা, হয় ত আজ রাতটা দারোগা সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। তুই ভাবিস্ না। আমি

কাল সকালবেলা নিশ্চয় আসব।” ডাকাতীর কথা কিছু বললে না, পাছে মা ভয় পায়।

পাড়ায় একটী ছেলের অসুখ ছিল। তাকে দেখে ঔষধ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা মালতী যখন ঘরে ফিরল, দেখলে বাহিরের দাওয়ায় কে বসে আছে সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে। জিজ্ঞাসা করলে, “কে গা তুমি?”

“চিনতে পারছিস্ না, মালতী?” বলে লোকটা মুখের চাদর খুললে। মালতী দেখে ফকীর।

ভয়ে অস্থির হয়ে হাঁক মারলে, “শম্ভু, একটা কথা শোন্ ত, বাবা।”

ফকীর হেসে বললে, “ভয় পাচ্ছিস কেন, মালতী? শম্ভুকে আমি একটা ছুতো করে ও পাড়ায় পাঠিয়েছি। তোর সঙ্গে দুটো কথা কইব বলে এসেছি।”

“না তুমি যাও, ফকীর। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।”

“না, তা যাব না, মালতী। তোর ছেলেটাকে আমি ভালবাসি। তাই তাকে দলে টানবার জন্য এত চেষ্টা করছিলাম। তুই তাকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাহারাওয়ালা করে দিলি। আচ্ছা, তা হোক গে। তাকে ত কোন দিন দুষমন ভাবতে পারব না, সে তোর ছেলে। মালতী, তোকে যে আমি কি চোখে দেখেছি বলতে পারি না। অনেক দিন তোর পিছনে ঘুরলাম। কিন্তু তুই একবার ফিরেও চাইলি না। তাই হায়রান হয়ে স্থির করলাম যে কোথাও দূরে চলে যাব, তোকে ভুলতে চেষ্টা করব। দু মাস এ গাঁ ও গাঁ ক’রে

দরজা ভেঙে ভেতরে আসব। ভেতরে কিন্তু আসবই আজ আমি।" বলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল।

খানিক পরে মালতী একটু সামলে নিলে। একবার ভাবলে, পালাই। আবার মনে হল, "পালাব কোথায়? গাঁয়ের মাঝে বরং একটু বাঁচাও আছে, কিন্তু পথে ফকীরের কবলে পড়লে কোন রক্ষাই নেই। ঠাকুর, গোবিন্দ! তোমার মনে যা আছে, তাই হোক্। আমি এখান থেকে নড়ব না।"

রান্নাবাড়া সেরে, তাড়াতাড়ি শম্ভুকে খাইয়ে, দেবারুর জন্য ভাত তরকারী তুলে রাখলে। শম্ভুর বকাবকিতে নিজে একবার খেতে বসল। কিন্তু গলা দিয়ে এক মুটো ভাতও নামল না। গুড় তেঁতুল জলে গুলে তাই এক বাটি খেয়ে উঠে পড়ল। শম্ভুকে বললে, "বাবা, তুই আজ বাহিরের দাওয়ায় শুয়ে থাক। তোর দাদা এলে আমাকে ডাক দিস্। শম্ভু শুয়ে পড়ল।

তার পর নিজে ভেতরে গিয়ে দোরের হুড়কো বেশ করে লাগিয়ে তার উপর ছেলের তক্তাপোশ টেনে আটকে দিল। দিয়ে শুয়ে পড়ল মাথা পর্য্যন্ত চাদর মুড়ী দিয়ে। ঘুম কোথা থেকে আসবে চোখে? কত ভাবনা এসে মাথায় তোলাপাড়া করতে লাগল। একবার মনে হল, ফকীর নিশ্চয় মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে গেছে, দরজা ভাঙ্গতে তার সাহস হবে না। আবার ভাবলে, সে ত ডাকাত, লোকের দরজা ভাঙ্গা ত তার নিত্যকার কাজ। উঠে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসল। প্রদীপের সেই মিটমিটে আলোয় মনে হল যেন গোবিন্দের মুখে হাসি। প্রাণে একটু ভরসা এল। দেবমূর্ত্তি কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে এনে নিজের শিয়রে

ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু তোকে কই ভুলতে পারলাম ! তাই আজ তোকে বলতে এসেছি যে আর তোর কথা শুনব না, আমি তোকে চাই।"

মালতীর সর্ব্ব শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল। তবু সাহসে ভর করে বললে, "সরদার, তুমি না একজন মস্ত জোয়ান, দেশময় লাঠিবাজী করে বেড়াও! আজ একটা অসহায়া মেয়েমানুষের কাছে বাহাদুরী দেখাতে এসেছ।"

ফকীর হাসলে, "ও সব কথায় আমি ভুলব না, মালতী। রেখে দে তোর হাসি টিটকিরি। ফুলের উপর লোভ হলে, আগে তাকে টেনে ছিঁড়তে হয় গাছ থেকে। তার পরে না তার আদর যত্ন! তোকে আজ আমি ছাড়ব না। যখন তুই আমার কাছে আসবি, তখন তোকে রাজরাণীর মত রাখব। কিন্তু আজ আমাকে জোর করতেই হবে।"

মালতী কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ফকীর, আমি ছেলের মা। আমাকে রেহাই দাও, দয়া করে।"

ফকীর হো হো করে হেসে উঠল, "ছেলের মা! কার ছেলে? মনে করেছিস আমি কিছু জানি না। ঘুরতে ঘুরতে রায়নগরে গেছলাম, তোর গুণের কথা সবই শুনে এসেছি। কবে থেকে এত সতী হলি, গো?"

মালতী দৌড়ে ঘরের ভেতর পালাল। দোরে আগড় দিয়ে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। ফকীর বাহিরে থেকে চেঁচিয়ে বললে, "আমি এখন চললাম, মালতী। শম্ভু ফিরে আসছে। তার সামনে এখনই একটা গোলযোগ করতে চাই না। কিন্তু ঘণ্টা দুই বাদ আসব, দোর খুলে রাখিস্। বুঝে রাখ্, যদি দরকার হয় ত

রাখলে। তখন প্রায় দেড় পহর রাত। চাঁদ ডুবেছে। বাহিরে কার পায়ের শব্দ হল। মালতীর বুকের ভেতরটা তুড়তুড় করে উঠল। কে! দেবারু! না ফকীর! কান পেতে রইল। একটু পরেই শুনতে পেলে ফকীরের কর্কশ গলা, "খবরদার, হারামজাদা। মুখ খুলবি কি মেরে ফেলব। যেমন প'ড়ে আছিস্, সেই রকম থাক্। মালতী, দোর খোল্ ঝট করে।"

মালতী কাঁপা গলায় উত্তর দিলে, "না, আমি খুলব না। তুমি ভাল চাও, ত দূর হও।"

"আচ্ছা, তোকে দশ মিনিট সময় দিলাম। তার পর না খুলিস্, ত তিন লাথিতে দরজা ভেঙ্গে চুরমার করে দেব।"

এমন সময় দূর হতে মালতীর কানে গানের আওয়াজ এল, "তমাল পাসে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে!" এ কি! এই যে দেবারু! লাফিয়ে উঠল মালতী। আর ভাবনা কি? কিন্তু যদি ফকীর হঠাৎ বাছাকে মারে! সজোরে চেঁচিয়ে উঠল, "দেবারু, বাবা, সাবধান। বাহিরে ফকীর বসে আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু এক লাফে দাওয়া থেকে নেমে চীৎকার করতে করতে দাদার দিকে ছুটল। দেবারু জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, রে! মা কি বলছিল?"

শম্ভু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "দাদা, ফকীর সরদার ঐখানে বসে রয়েছে, বলছে দোর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকবে।"

"কোথায় সরদার? তোমার জন্যই আমার এত রাত্রে আসা।"

"এই যে সাকরেদ, দাওয়ায় বসে আছি।"

দেবারু মাকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, কি হয়েছে আমাকে বল্ ত।"

"সব বলব। আগে তুই ফকীরকে যেতে বল্।" মায়ের গলা যেন কাঁপছে।

দেবারু তখন ফকীরের সম্মুখে পা ফাঁক করে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বললে, "ওস্তাদ, দূর হও এখান থেকে।"

ফকীর টপাক্ করে লাফিয়ে উঠে লাঠি ধরে বললে, "কালকের ছেলে এখনও গাল টিপিলে দুধ বেরোয়! তুই চাপরাস বেঁধেছিস ব'লে আমাকে হুকুম চালাস্!"

দেবারু খুব ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিলে, "দেখ সরদার, তোমার কাছে আমি হেতের চালাতে শিখেছি, তুমি আমার ওস্তাদ। তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে। আজ রাত্রেই পুলিশ আসছে তোমার সন্ধান করতে, পরোয়ানা জারী করতে। পালাও তুমি।"

"তা পালাব। কিন্তু তুই এখন স'রে পড় খানিকক্ষণ। তোর মায়ের সঙ্গে আমার একটু বরাত আছে। আমার কথা শুনিস্, ত একটা হাজার টাকা গুনে দেব।"

মালতী ভেতর থেকে আবার হাঁকলে, "দেবারু, ফকীর অমনি না যায়, তাকে মেরে তাড়িয়ে দে!"

শুনে দেবারু চেঁচিয়ে উঠল, "সরদার, শুনলে আমার মায়ের হুকুম? দূর হও এখনই।"

ফকীর কোন কথা কইল না। দেবারু তার ছাতিতে এক লাঠির

গুঁতো মেরে বললে, "লাঠি তোল, সরদার। নইলে এক ঘায়ে তোমার মাথা দোফাঁক করে দেব।"

"তবে রে হারামজাদা!" ব'লে ফকীর এক হুঙ্কার ছেড়ে দু হাতে লাঠি ঘোরাতে আরম্ভ করলে। লেগে গেল দুজনে। লাঠির ঠকাঠক্ শুনে মালতী আর থাকতে পারলে না। দোর খুলে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে ফকীর বলে উঠল, "দেখ্, এখনও রাজী হ'। তাহলে তোর ছেলেকে ছেড়ে দিই। নইলে,"—দেবারুর লাঠি বিদ্যুদ্বেগে এসে পড়ল ফকীরের মাথার পেছনে। বিকট শব্দ ক'রে সে ভুঁইয়ে পড়ে গেল।

যখন মালতী তাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে তার মুখে চোখে জলের ঝাপটা মারলে, সে একবার চোখ খুলে শুধু এইটুকু বলতে পারলে "ভালই হল, মালতী, নইলে ফাঁসী যেতে হত।" তারপর দেবারুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বুজলে।

—নয়—

ফকীর মরে গেলে, দেবারু মালতীর পায়ে মাথা কুটতে লাগল, "মা, কেন তোর কথা অগ্রাহ্য করে লাঠিখেলা আরম্ভ করেছিলাম! শেষ পর্য্যন্ত মানুষ খুন করলাম। আর যে সে মানুষ নয়, নিজের ওস্তাদ! হলই বা সে চোর ডাকাত, আমার ওস্তাদ ত বটে! তার প্রাণ নিলাম! আজ থেকে ছেড়ে দেব লাঠিখেলা। তোর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি, মা, আর জীবনে কখন লাঠি ধরব না।"

মালতী ছেলের মাথায় হাত রেখে বললে, "তা ধরিস্ না, বাবা। বেঁচে থাক্ তুই! নাই বা চাকরী করলি, চাষ করে খাবি।"

"হ্যাঁ মা, ফকীর এই রাত্রে তোকে ভয় দেখাতে কেন এসেছিল?"

"আর কি করতে আসবে, বাবা! এসে দুশো টাকা চাইলে। আমি পালিয়ে গিয়ে দোরে আগড় বন্ধ করে দিলাম।"

"দেখ্ মা, পরশুকার খুন ডাকাতী ওরাই করেছে। দারোগা ওকে খুজে বেড়াচ্ছেন। তাই পালাবার জন্য, বোধ হয়, ওর টাকার দরকার হয়েছিল।"

"তা হবে, বাছা। কিন্তু এখন তোকে কি ক'রে বাঁচাই!

"আমার কি দোষ, মা! আমার বাড়ী ডাকাতী করতে এসেছিল। আমি তাড়াতে গেলাম। লড়াই হল। ন্যায্য লড়াইয়ে ওর মাথা ফেটে গেল। এতে আমার ত কোন কসুরই হয় না।"

"ও সব কথা কে বিশ্বাস করবে, দেবারু! চল্ যাই নায়েব বাবুর কাছে!

তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলি, যদি তিনি দয়া করে আমাদের দিকে দাঁড়ান। শম্ভু, তুই ঘরে থাক, বাবা।”

মালতীর বাড়ীর কাছাকাছি যে দুখানা বাড়ী ছিল, তার লোকেরা লাঠির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ডাকাত পড়েছে ভেবে, বেশ করে মুড়ী দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইল, নড়ল না। যখন আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হল, তারা দরজা একটু ফাঁক করে উকী মারলে, কিন্তু কিছু নজরে পড়ল না অন্ধকারে। বাহিরে যেতে সাহসে কুলাল না।

দেবারু আর তার মা সীতানাথ নায়েবের বাড়ী গিয়ে ডাকাডাকি করলে, তিনি গজর গজর করতে করতে বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “এত রাত্রে কে তোরা? আমায় কেন জ্বালাতন করতে এসেছিস্?”

“আমি দেবারু চৌকীদার। আমার সঙ্গে আমার মা এসেছে, নায়েব বাবু। আমাদের উপর কৃপা করে একটু শুনবেন আমাদের দুঃখের কথা?”

“সকাল বেলা শুনলে হবে না?”

“না হুজুর। একটা বড় বিপদ হয়েছে। ফকীর ডাকাত আমার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে গিয়ে মারা গেছে। আমাদের বাড়ীর সামনে লাশ পড়ে আছে। একবার আসুন দয়া করে।”

“আমাকে আবার এ সব হাঙ্গামার ভেতর জড়াস্ কেন? তুই ত পুলিশের লোক! যা ভাল বুঝিস্, করগে যা।”

মালতী সীতানাথের পা জড়িয়ে ধরলে, “নায়েব দাদা, চিরদিন আমাদের উপর দয়া করে আসছেন, আজকের দিনে আমার ছেলেকে

রক্ষা করুন। দেবারু ত আপনাদের সবাইকার চাকর। গ্রামের কাজ করতে গিয়ে এই বিপদে পড়েছে।"

"আচ্ছা, চল।" বলে সীতানাথ মালতীদের সঙ্গে বের হলেন। বাড়ী পৌছে, মালতী ছেলেদের বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে, যা যা ঘটেছিল সব তাঁকে খুলে বললে। বলে একশো টাকার এক থলি বের করে তাঁর সামনে রাখলে। নায়েব বাবু টাকার থলি তুলে মালতীর হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার টাকা তুলে রাখ, মালতী। আমি এ খুনের মামলার ভেতর যেতে চাই না, আমার মনিব রাগ করবেন। তুমি এক কাজ কর। কাল সকালই রায়নগর যাও। না, আমি কিছুতেই বলব না, কেন এ কথা বলছি। তুমি চোখ বুঝে আমার পরামর্শ মত কাজ কর, ভাল হবে। রায়নগরে গিয়ে তোমাদের রাণীমার কাছে সমস্ত বুঝিয়ে বল, তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।"

বাহিরে গিয়ে ডাকলেন, "কোথায় রে, দেবারু, শম্ভু!" তারা এলে পর বললেন, "একটা জরুরী কাজ আছে। ধর দেখিনি দুজনে। ফকীরকে ধবলায় ভাসিয়ে দেওয়া যাক।" তিন জনে ধরে, লাশ আর ফকীরের লাঠি নদীতে ফেলে দিলেন। যাবার সময় দেবারুকে বলে গেলেন, "দেখ্ চৌকীদার। তোর মাকে কাল এক জায়গায় পাঠাচ্ছি। তুই এইখানে থাকবি। দারোগা জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রের গল্পটা এই রকম বলবি—তোর মা এখানে রাত্রে একা থাকতে ভয় পেয়েছিল, তাই শম্ভুকে নিয়ে আমাদের কাছারী বাড়ীতে গিয়ে শুয়েছিল। তুই সেটা জানতিস, তাই তুই ভুলুয়াতে ফিরে সোজা কাছারীতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলি। এখানে কি হয়েছে না হয়েছে তা কিছুই জানিস্ না।"

পরদিন সকাল বেলা নায়েব বাবুর পরামর্শ মত মালতী শম্ভুকে নিয়ে রায়নগর রওয়ানা হল। যাবার সময়, দেবারুর দাড়ী ধ'রে চুমু খেয়ে অনেক করে বলে গেল, "সাবধানে থাকিস্, বাছা। বড় বিপদের দিন যাচ্ছে আমাদের।"

পাড়ায় একটা জনরব উঠেছে যে রাত্রে ডাকাত পড়েছিল, খুব লাঠালাঠি মারামারি হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব ফেরবার পথে এই খবর শুনে, তদন্তের জন্য একদিন রয়ে গেলেন। দেবারুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ফেরবার পর কিছু শোর-গোল শুনেছিলি?"

"না হুজুর, আমার মা বলেছিল-শম্ভুকে নিয়ে কাছারী, যে বাড়ীতে শুতে যাবে, তাই আমি সিধে সেইখানেই গেছলাম। ও পাড়ায় কিছুই গোলযোগ হয় নেই।"

নায়েবও বললেন, "না, না, দারোগা সাহেব: আমাদের এ দিকটায় কোন গোলই হয় নেই।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবারু, তোদের কিছু যায় নেই ত?"

"না হুজুর, আমাদের দরজার কুলুপ যেমনকার তেমনি বন্ধ ছিল। মা যাওয়ার আগে সব দেখে শুনে গেছে। আমাদের কিছুই খোয়া যায় নেই।"

দারোগা একটু চিন্তিত ভাবে নায়েবকে বললেন, "মশায়, ও গাঁয়ের ডাকাতী করেছে ফকীরের দল। খুনের সময় তাকে দুজন সাক্ষী চিনতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাটা এমনই গা ঢাকা দিয়েছে, যে কোন পাত্তা করতে পারছি না। আমার মনে হয়, কাল রাত্রে নদীর ধারে ওরাই এসেছিল চোরাই মালের বাটোয়ারা করতে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি

করেছে। কিন্তু হারামজাদা গেল কোথায়? কাল ফকীরকে এ গাঁয়ে কেউ দেখেছিল কি?"

দেবারু বললে, "না দারোগা সাহেব। অনেক খোঁজ করেছি। তাকে কেউ দেখে নেই। লাঠালাঠি যখন হচ্ছিল, তখন ভয়ে পাড়ার কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে নেই।"

বিকেলের দিকে বনগাঁয়ের এক চৌকীদার দৌড়তে দৌড়তে এসে দারোগাকে খবর দিলে যে পাঁচ কোশ দূরে নদীর কিনারে ভোর বেলা এক লাশ পাওয়া গেছে। লাশ, বোধ হয়, ভুলুয়ার ফকীর সরদারের। দারোগা ঘোড়ায় চড়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। বনগাঁয়ে পৌছলেন সূর্য্যাস্তের সময়। লাশ দেখেই চিনলেন। পা দুটো তখনও জলে প'ড়ে। ধড়টা আটকে গেছে এক কাঁটা গাছে। সেখানকার করণীয় যা কিছু সমাধা করে রাতারাতি লাশ চালান করলেন ডাক্তারের কাছে।

ভুলুয়াতে ফিরে সীতানাথকে বললেন, "নায়েব বাবু, সেই ব্যাটাই বটে। এখন বোঝা যাচ্ছে, কি হয়েছিল। এখানে মারামারির পর ফকীরের লাশ ওরা ভাসিয়ে দিয়েছে ধবলার জলে। ভেসে ভেসে গিয়ে লেগেছে বনগাঁয়ে কাঁটা ঝোপে। যাক্, আমাদের অনেক তসদী বাঁচল। খোদা নিজেই সাজা দিলেন হারামজাদাকে। এখন, ওকে যে মেরেছে তাকে ধরে লটকাতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

দেবারু সেখানে হাজির ছিল। একবার ভাবলে, "বলে দিই সব কথা। চুকে যাক্ ভাবনা চিন্তা।"

আবার মনে হল, "বললেই ত গেরেপ্তার হব। যতদূর বুঝছি, ছাড়া পাব শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু ততদিনে মা ভেবে ভেবে মরে যাবে। কাজ

নেই, চুপ করে থাকাই ভাল। আমি ত আর সত্যি অন্যায় কিছু করি নেই। একে ফেরারী আসামী, তায় আমার বাড়ী লুটতে এসেছিল, তাকে মারব না ত কি আর আদর করব? যাক্, লাঠির সঙ্গে সম্পর্ক ত এইবার ঘুচল! এখন কি করব! ঘুমিয়ে দিন কাটাতে হবে। তা হোকগে, মা খুশী হলেই হল। ঠাকুর! তুমি আমার মাকে আর দুঃখ দিও না।"

—দশ—

মালতী রওয়ানা হওয়ার আগেই সীতানাথ রায়নগরের সদর নায়েবের কাছে তারে খবর পাঠিয়েছিল, "তুলেনী আজ রায়নগর যাচ্ছে। তার সঙ্গে রাণীমার দেখা করিয়ে দিও।"

রেলে যেতে যেতে মালতী কত কথাই ভাবছিল। জন্ম হতে আজ পর্য্যন্ত ভাল মন্দ যত ঘটনা হয়ে গেছে, সব যেন তার চোখের সামনে ভাসছে। লোকে যাই বলুক, সে পাপ কিছুই করে নেই। রাজাবাবুকে যে সে ভাল বেসেছে, সে ত তার পুণ্যফল। সেই ভালবাসা থেকে সে তার গোবিন্দের সন্ধান পেয়েছে। আর, দেবারুকে না পেলে তার জীবন ত একেবারে ব্যর্থ হত! আজ যদি আবার তাকে ফিরে-ফিরতি জীবন কাটাতে হয়, ত ওই একই ভাবে কাটাবে। তাতে যদি মরে গেলে নরকে যেতে হয়, ত যাবে। কিন্তু, এ জীবনে সে যে স্বর্গ সুখ পেয়েছে, আজও যা পাচ্ছে, তা সে কি ভুলতে পারে? কিন্তু গোবিন্দ আজ তার ছেলেকে এ বিপদে ফেললেন কেন? দেবারু ত কোন অপরাধ করে নেই, কোন দিন তাঁর চরণে। হয় ত পরীক্ষা করছেন দুজনকেই। বিপদ বলে সত্যি কোন জিনিস আছে কি? আমার গোবিন্দের দেওয়া জিনিস ত মঙ্গল বই আর কিছু হতে পারে না। তা দাও, প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা তাই দাও। বলে বেচারা মালতী হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। এই যে এত দিন পরে রায়নগর যাচ্ছি, এ ত আমার রাজাবাবুকে দেখবার জন্য নয়। এ শুধু আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা করতে যাচ্ছি। আমার

ছেলে। তাদের ছেলে নয় দাবী আমার কিছুই নেই। ভিক্ষা মাগতে যাচ্ছি আমি। আর সে ভিক্ষা মাগব আমার রাজার কাছে নয়, তাঁকে ত ছেড়ে চলে এসেছি। মাগব রাণীর কাছে, যিনি আমার ছেলেকে রায়নগর থেকে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন। দয়ার শরীর তাঁর। আমাকে ত তিনি অপরাধী করেন নেই। বরং বোনের মত দেখেছিলেন। নায়েব বাবুর কথা থেকে মনে হল, রাণী আমাদের খবর আজও রাখেন। যাই হোক, পায়ে ধরে তাঁর কাছে আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা করব। ছেলের মা হয়েছেন তিনি, আমার দুঃখ নিশ্চয় বুঝবেন।

গোবিন্দ, যদি আমার এই রায়নগর যাতায়াতে কোন পাপ হয়, ত তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, আমাকে দয়া কোরো। কিন্তু যদি রাজাবাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়! কথাটা মনে হতেই বুকের মধ্যে যেন কে হাতুড়ী মারতে লাগল। যদি দেখা হয়, ত কি বলব? যদি তিনি পুরানো কথা বলেন, ত কি করব? না, না, তিনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন আমাকে। এ কি সব কথা ভাবছি আমি। ঠাকুর! আমায় ক্ষমা কোরো, আমার দোষ নিও না। আমি তোমারই। তুমিই আমার রাজাবাবু। দেবারুকে আমার বাঁচিয়ে রেখো, ধর্ম্মে যেন তার মতি থাকে।

রেল যখন রায়নগর রোড ষ্টেশনে পৌছল, এক বৃদ্ধ, "মালতী কই?" "মালতী কই?" চেঁচাতে চেঁচাতে প্লাটফরমে দৌড়াদৌড়ি করছিল। তাকে দেখেই মালতী চিনতে পারলে। "এই যে আমি, সনাতনদা," বলে নেমে ঢিপ করে প্রণাম করলে।

বুড়ো আনন্দে অধীর হয়ে দাড়ী ধরে আদর করে বললে, "তেমনিটীই ত আছিস্! এই বুঝি তোর ছেলে?"

"না দাদা, এটী দেবারুর মাসতুতো ভাই।"

সনাতন তুজনকে গরুর গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে গেল খামার বাড়ীতে। নায়েব সাধুচরণের সঙ্গে মালতীর পরিচয় হল। লোকটী মোটেই তার কাকার মত নয়। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ফিটফাট, কলেজে পড়া ছেলে। সে মালতীকে আপনি আপনি করে কথা কইতে লাগল। থাকতে একটী ভাল ঘর দিলে।

মালতী তাকে বললে, "নায়েব দাদা, আপনি কি জানেন না যে আমি এই খামারে গোয়াল-ঘরের ঝি ছিলাম। আপনার কাকা কাকীমার আশ্রয়ে বড় হয়েছিলাম ছোট্টটী থেকে। এ রকম ঘরে বাস করতে দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। যদি পারেন ত আমার পুরানো গোয়ালের এক কোণে আজকের দিনটা পড়ে থাকতে দেন।"

"তা বেশ ত! কিন্তু আপনি—তুমি দিন তুই চার থাকবে না এখানে?"

"না, আমাকে কালই ফিরে যেতে হবে, যদি দয়া করে আজ রাণী-মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন।"

"আচ্ছা, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম কর। বিকেলে তিনটের সময় নিয়ে যাব।"

বেলা তিন প্রহরের সময় নায়েব বাবু তুলেনীকে রাজবাড়ীর খিড়কী দরজায় পৌছে দিয়ে একজন ঝিকে বলে দিলে, "ভুলুয়া থেকে মালতী তুলেনী এসেছে। রাণীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। খবর দাও। তাঁর হুকুমেই আমি এনেছি।"

একটু পরে ঝি এসে মালতীকে উপরের সেই পুরানো বারান্দায়

নিয়ে গেল। রাণী শান্তা দেবী বসে রয়েছেন। একটী তের চৌদ্দ বছরের ছেলে কি পড়ে শোনাচ্ছে। মালতীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল আছ, মালতী দিদি? দেবারু ভাল আছে ত?"

মালতী একটী ছোট খাটো নমস্কার করে উত্তর দিলে, "আমাকে ভুলে যাও নেই তাহলে, রাণীদিদি? ভালই আছি তোমাদের আশীর্ব্বাদে। আমি তোমার কাছে এসেছি দেবারুর জন্যই। সে বিপদে পড়েছে, বিনা দোষে। যদি তুমি দয়া কর, ত বেঁচে যায়।"

"আমাকে বল কি হয়েছে। সমর, তুই একটু নীচে খেলা করগে যা ত, বাবা। একটু পরেই আবার ডাকব।"

"দিদি, আমি একবার খোকাবাবুকে ছুঁলে দোষ আছে কি?"

"না না, সমর। মালতী যে আমাদের রায়নগরেরই মানুষ! তোর মাসী হয়।"

কুমার সমরেন্দ্র সলজ্জ ভাবে আস্তে আস্তে নূতন মাসীর কাছে গেল। মাসী তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলে, "দীর্ঘজীবী হও, বাবা। বাপ মায়ের, বংশের, মুখ উজ্জল কর। গরীব প্রজাদের মা-বাপ হও।"

ছেলে নীচে গেলে পর মালতী বললে, "দিদি, খোকাবাবু ঠিক তোমার মতন হয়েছে। ঐ হাসি হাসি মুখ, যেন করুণায় আর মায়াতে ভরা।"

"হ্যাঁ, সবাই বলে ওর চেহারা আমারই মত হয়েছে। এখন বল, বোন, কি হয়েছে তোমার ছেলের।"

মালতী আগাগোড়া সব ঘটনা বললে। রাণী বললেন, "দেবারুর কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। তার ত লাঠি

না ধরে উপায় ছিল না। তবু আজই লিখে পাঠাচ্ছি আমি আমার দাদার কাছে, তিনি নজর রাখবেন। আমার দাদা, মামাতো ভাই, তোমাদের ভুলুয়ার জমীদার, তা জান ত?"

"না, তা আমি জানতাম না, দিদি। এখন অনেক জিনিসই স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি দয়া করলেই আমার দেবারু বাঁচবে।"

"কদিন এখানে আছ, মালতী দিদি?"

"কালই চলে যাচ্ছি, রাণীদিদি। আর কোন দিন হয় ত দেখা হবে না। কিন্তু না বলে পারি না, কি সুন্দর মনটী তোমার। আমাকে ঘৃণা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তা না করে, প্রথম দিন থেকে আমাকে এমন করছ যেন আমি তোমার আপনার লোক। আজ বুঝছি যে গেল আঠার বছর কে আমাদিকে সমস্ত দুঃখ কষ্ট হতে বাঁচিয়ে রেখেছে। দীর্ঘজীবী হও, দিদি। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে ঘর কর। যে প্রজারা তোমার মত রাণী পেয়েছে, তাদের দুঃখ কি!"

"ঘৃণা কখনও আমি কাউকে করি না, মালতী, করতে পারি না। নিজের ঘর সংসার বাঁচাতে গিয়ে তোকে আর তোর ছেলেকে দেশত্যাগী করতে হয়েছিল, সে দুঃখ আমার আজও যায় নেই। তখন ছোট ছিলাম, ভাল করে সব কথা বুঝতাম না। তোকেও সে দিন চিনতে পারি নেই। তাই ভুল অনেক করেছি। ফলও ভুগছি। তোর আশীর্ব্বাদ সফল হোক, বোন। আবার আমার সংসারে, আমাদের রাজ্যে, সুখ শান্তি ফিরে আসুক। সমর আমার দীর্ঘজীবী হোক।"

একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, মালতী, তুমি কি দেখা করে এসেছ, না সোজা আমার কাছেই এসেছ?"

"না দিদি, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই রায়নগরে এসেছিলাম সোজা তোমার কাছেই এসেছি। আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা তুমি দিলে। আমার কাজ হয়ে গেল। কাল ফিরে যাব।"

"তাই ভাল, বোন। তবু যদি একবার—"

"না, রাণী দিদি। কাজ নেই। আমার গোবিন্দের পূজার ফুল একটু এনেছিলাম। এই নাও। তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে দিও। কারও নাম কোরো না। আসি তবে, দিদি?" বলে মালতী ধীরে ধীরে নীচে গেল।

শান্তা দেবী খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। তার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডাকলেন, "সমর বাবু।" "যাই মা" বলে হাঁক ছেড়ে তিন লাফে সমরেন্দ্র এসে উপস্থিত হল। মার মুখের পানে তাকিয়ে বললে. "ও কি, মা, তোমার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? একটু হাসো, নইলে আমি পড়ব না। আচ্ছা, উনি কে, ঐ যে দুলেনী মাসী এসেছিলেন? ছেলেবেলায় আমায় মানুষ করেছিলেন বুঝি!"

"না, বাবা। তুই তোর মার কোলেই মানুষ হয়েছিলি। তোর দুলেনী মাসী তোর জন্মের আগেই রায়নগর ছেড়ে গেছলেন। বেচারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, বাবা, আমাদের জন্যই। একটু কাছে আয়, তোর মাথায় মালতীর পূজার ফুল ঠেকিয়ে দিই।"

—এগার—

রাজ-বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলেছে মালতী থামার বাড়ীর দিকে। মন বড় প্রসন্ন। রাণী যখন ভরসা দিয়েছেন, আর ছেলের জন্য কোন ভাবনা নেই। এতক্ষণ ছেলেটা কি করছে কে জানে। এত বড় হল, কিন্তু কখন মা ছেড়ে ত থাকে নেই। এই প্রথম। তা অভ্যাস হোক্ একটু একটু, মা কি আর চিরদিন থাকবে!

আচ্ছা, রাণীকে ত সুখী দেখলাম না। কিসের দুঃখ তার! রাজাবাবুর মতন স্বামী, সমরের মতন ছেলে, এই রাজ্যপাট, এতে যদি মানুষ সুখী না হয়, ত কিসে হবে! আচ্ছা! সেই আঠার বছর আগে রাণীকে দেখে-ছিলাম, আর আজ দেখলাম। কিছু তফাৎ হয়েছে কি? দয়া মায়া ত তখনও ছিল। তবে? হ্যা, বুঝেছি। তখনকার রূপে যেন চোখ ঝলসে যেত; আর এখনকার এই দুর্গা প্রতিমার মত মুখ বার বার ফিরে দেখতে ইচ্ছা করে। কি আদরই করলে আমাকে! যেন সত্যিই ওর বোন! গরীব দুলেনী বলে কোনও তফাৎ রাখলে না। বোধ হয় মনে করলে, "আমি যেমন ছেলের মা, ও গরীবও ত তাই।"

রাজাবাবুর নাম একবারও করলে না। আমার কাছে তাঁর নাম করতে, বোধ হয়, লজ্জা হল। তা কিসের লজ্জা? আমি ত ওর স্বামীকে চাই না। আমার যা পাওয়ার পেয়েছি, জীবন সার্থক হয়েছে, আর ত কিছুর প্রত্যাশী নই।

এই রকম নানা কথা মনে তোলাপাড়া করতে করতে মালতী

চলেছে। হঠাৎ শুনতে পেলে দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। চমকে উঠল। সেই রাস্তা, সেই ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ! কে আসছে? এতদিনের সংযম বুঝি যায় যায়! বুক ছুড় ছুড় করে উঠল। মুখ চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। রাস্তার পাসে এক বকুল গাছ ছিল। তার গুঁড়ি ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়া কাছে এলে, সওয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে তুই?" মালতী একবার চোক খুলে দেখে, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে, আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, "আমি মালতী ছলেনী। ভুলুয়া থেকে এসেছি।"

সওয়ার ঘোড়া থেকে টপ্ করে এক লাফে নেমে পড়ল। মালতীর দাড়ী ধরে মুখটী তুলে দেখে জড়িত স্বরে বললে, "তা-ই-ত ব-টে। আমার মা-লী-ই-ত! এ-সে-ছিস্ আ-মা-র কাছে আবার! চল্, আম-বা-গা-নে যাই। সেইখানে আমি থা-কি।"

রাজাবাবুর মুখে মদের গন্ধ। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। "হা গোবিন্দ, এই আমার রাজাবাবু! কেন এলাম রায়নগরে?" মালতীর ছ চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

বাবু মালতীর ছ হাত চেপে ধরে বললেন, "বা! তুই তেমনিই সু-ন্দ-রী র-য়ে-ছিস্। কে বলবে, আ-ঠা-র বছর কেটে গেছে। আয় আমার কাছে, ল—ক্ষী—টী!"

মালতী ধীরে ধীরে রাজাবাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়াল। বাবু অট্টহাস্য হেসে বললেন, "কি হল আবার? বু—ড়ো হয়েছি ব—লে মনে ধরছে না?"

মালতীর পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল এখনই পড়ে

যাবে। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললে, "বাবু, আপনি বাড়ী যান। রাণী-মা আপনার জন্য বসে রয়েছেন।"

বাবু আবার হেসে উঠলেন, "তুই আবার তার কাছেও গেছলি না কি? দু সতীনে কি করলি? আমার খুব গুণ গান করলি ত?"

মালতী আর সহ্য করতে পারলে না। গড় হয়ে প্রণাম করে বললে, "বাবু, আমায় ছুটী দেন, আমি যাই।"

"তা যা না! আমবাগানে যদি না আসবি, ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে আর কি ইয়ারকী দেব! নেশাটা ছুটে গেল তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে। যা, যা।" খট্ খট্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

মালতী খানিকক্ষণ বকুল তলায় ঠেস দিয়ে বসে রইল। একটু সুস্থ হলে ধীরে ধীরে টলতে টলতে খামারে ফিরে গেল। শম্ভু তাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল, "কি হয়েছে তোর, মাসী? জ্বর টর এল না কি? একটু শুয়ে পড়।"

মাসী ক্ষীণ স্বরে বললে, "শম্ভু, বাবা, আমাকে একটু জল দে। রোদে চলতে চলতে কেমন মাথাটা ঘুরে গেছে।"

ঘণ্টা খানেক পরে সাধুবাবু এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "শম্ভুর কাছে শুনলাম আপনার সর্দ্দি-গরমি হয়েছিল। এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

"আমি ভাল আছি, নায়েব দাদা। কিন্তু আমার বড় মন কেমন করছে ছেলের জন্য আমি আজ রাত্রের গাড়ীতেই ফিরে যাব। রাণীমার কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি।"

"শরীরটা ভাল নেই, আজকের রাতটা থেকে গেলেই হত। তা

রাণীমা যখন হুকুম দিয়েছেন, তার উপর কথা নেই। আমি সনাতনকে ডেকে পাঠাই, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবে।"

ষ্টেশনে সনাতন জিজ্ঞাসা করলে, "মালী, রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। কত দিন বাবুর এ দশা হয়েছে, সনাতনদা ?"

"অনেক দিন হল এই রকমই চলছে। তুই চলে যাওয়ার পর কাজ কর্ম্ম দেখা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন। সারাক্ষণ রাণীমার কাছে বসে থাকতেন। খোকাবাবুর জন্মের পর রাজবাড়ীতে থাকাও ছেড়ে দিলেন। আমবাগানের বাঙ্গলা বড় করা হল। সেই খানেই থাকেন। এমন যে সোনার চাঁদ খোকাবাবু, তারও আর মুখ দেখেন না। কদাচ কখন ঘোড়ায় চেপে বেরোন, নইলে সেই বাঙ্গলার দাওয়ায় বড় কেদারায় পড়ে আছেন। রাণীমাকে কেমন দেখলি, দিদি ?"

"বড় ভাল লাগল, সনাতনদা। কি সুন্দর কথাবার্ত্তা! কি দয়া মায়া! সত্যি রাজরাণী।"

"হ্যাঁ মালতী, সত্যিকার রাণী। ওঁরই ভয়ে রাজাবাবু প্রজার উপর অত্যাচার করতে পারেন না, নইলে এ রাজ্য ছারখারে যেত। সেই রাজাবাবু কি করে এমন হল, মালতী ? কেন তুই চ'লে গেলি ?"

"দাদা, চলে গেছলাম বলেই তোমাদের স্নেহ ভালবাসা হারাই নেই।"

"দেবারু কেমন আছে, মালী ? বেশ জোয়ান হয়েছে ত ? লাঠি ধরতে শিখেছে, না ইস্কুলে-পড়া বাবু হচ্ছে ?"

"ইস্কুলে দিন কয়েক পড়েছিল, দাদা। কিন্তু লাঠি ধরতে খুবই শিখেছে। গাঁয়ের চৌকীদার হয়েছে।"

"দেখতে কেমনটী হয়েছে ? তোর মতন মিষ্টি নরম মুখখানি ত ?"

মালতী খুব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে, "দেবারু ঠিক তার বাপের মতন দেখতে হয়েছে। গোবিন্দ তাকে রক্ষা করুন !"

"আমি আশীর্ব্বাদ করছি, দেবারু বেচে থাক্, তোকে সুখী করুক !" এই রকম কথা কইতে কইতে ট্রেন এসে পড়ল। মালতী সনাতনকে প্রণাম করে একটা খালী গাড়ীতে উঠে বসল। ট্রেণ ছাড়লে পর অনেকক্ষণ দু হাতে মুখ ঢেকে পড়ে পড়ে কাঁদলে। বেচারা শম্ভু মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলে না। কিন্তু ছেলে মানুষ, ভয় খেয়ে গেল। কি করে, বসে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটা রাত বই ত নয় !

ভুলুয়া গ্রাম রেল থেকে তিন কোশ দূরে। ষ্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছল, মালতী দেখে, দেবারু তাকে নিতে এসেছে। হেঁকে বললে, "এই যে বাবা, এই গাড়ীতে আমি !"

শম্ভু দেবারুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "দাদা, মাসীর বড় অসুখ করেছে। সারারাত ঘুমোয় নেই, যাতনায় গোঁ গোঁ করেছে। তুমি একটা গরুর গাড়ী ধর। আমি মাসীকে নামিয়ে বসাচ্ছি।" দেবারু দৌড়ে গেল গাড়ী ভাড়া করতে। শম্ভু মাসীকে এক রকম কোলে করেই নামালে।

গাড়ীতে বেশ করে খড় বিছিয়ে মালতীকে শুইয়ে দিয়ে দু ভাই সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল।

দেবারু জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছিল রে, মায়ের ? অমন পাঙ্গাস চেহারা হল কি করে ? হাত পা এখনও কাঁপছে।"

"কে জানে, দাদা। আমাকে খামারে রেখে ওখানকার নায়েব বাবুর

সঙ্গে রাজবাড়ীতে, না কোথায়, গেল। ফিরে যখন এল, চলতে পারছে না, টলছে। আমি তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়ে মুখে চোখে জল দিলাম। তখনকার মতন একটু সামলে গেল। কিন্তু রেলে উঠে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। কেমন গোঁ গোঁ করতে লাগল, সব শরীর কাঁপতে আরম্ভ হল, আমার বড্ড ভয় হয়েছিল, দাদা।"

দেবারু গাড়ীর কাছে গিয়ে চুপি চুপি মাকে বললে, "তোর আর ভয় নেই, মা। ফকীরের মরা নিয়ে আমাদের আর কোন বিপদে পড়তে হবে না। দারোগা রিপোর্ট করেছেন, তার দলের লোক কেউ তাকে খুন করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নায়েব বাবুও কাল কানে কানে আমাকে বললেন, যাক সব গোল মিটে গেল, তোর মায়ের বরাত ভাল।"

"তা বেশ হয়েছে, বাবা। বরাত বলে কিছু নেই রে, দেবারু। এ সবই আমার গোবিন্দের খেলা। রায়নগরের রাণীমাও ভরসা দিয়েছেন —তিনি দেখবেন যে তুই কোন বিপদে না পড়িস্।"

"তোর কি হয়েছে, মা?"

"কিছু না, দেবারু। তোর জন্য বড্ড মন কেমন করছিল, বাবা।"

"শুধু তা ত নয়, মা! আমি বুঝতে পারছি আরও কিছু হয়েছে। তোকে কেউ কিছু বলেছে? বল্, তা যদি হয় ত তাকে মেরে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি।

মালতী ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলে, "এই না তুই আমার পায়ে হাত দিয়ে লাঠি ধরা ছেড়ে দিয়েছিস্!"

"লাঠির দরকার হবে না রে, মা! তোকে অপমান করলে আমি

তাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। বলবি না আমাকে, তোকে কেউ কিছু বলেছে কি না?"

মালতীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কোন রকমে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, "নে বাবা, তোর মেজাজ খারাপ করে কাজ নেই। আমি ফিরে ত এসেছি। আমাকে কেউ খেয়ে ত ফেলে নেই!"

—বারো—

বাড়ী ফিরে মালতী বিছানা নিলে। উঠলেই কি রকম হাঁপ চড়ে, তাই দেবারু তাকে উঠতে দেয় না। দেবারু চৌকীদারীতে ইস্তাফা দিয়েছে। দুই ভাইয়ে মিলে ঘরকন্নার কাজ সব দেখে।

ছেলে দু তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে,, "রায়নগরে কি হয়েছিল, বল্ মা। তুই নিশ্চয় আমার কাছে কথা লুকোচ্ছিস।" কিন্তু কোন উত্তর পায় নেই। ছেলেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য মা জোর করে হাসি তামাশা করে, গল্প করে।

একদিন সকালে এক প্রহর বেলার সময় দেবারু বাহিরের দাওয়ার উপর বসে আছে, এমন সময় এক বুড়ো ফকীর এসে উপস্থিত হল। দেবারু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "একটু বসে জিরোও, ফকীর সাহেব। আমি দু মুঠো চাল নিয়ে আসছি তোমার জন্য।"

"না বাবা, তুমি উঠো না। আমি ভিক্ষা চাই না। তুমি নিশ্চয় দেবারু। না?"

"আমাকে তুমি চেন, সাহেব?"

"খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম রায়নগরে। তোমার মাকে গিয়ে বল, যে আহমদ সাহেব এসেছেন। চিনতে না পারেন ত বোলো, রায়-নগরের ওস্তাদজী।"

"আমি এক্ষণই বলছি। কিন্তু মায়ের বড় অসুখ, শুয়ে আছেন।"

"তুমি তাঁকে বল, বাবা। আমি একবার দেখেই চলে যাব। আর কদিনই বা আছি! অনেক দূর থেকে এসেছি।"

দেবারু উঠে ভেতরে গেল। ভেতর থেকে মালতী ডাকলে, "কাকা সাহেব, আসুন! পায়ের ধুলো দিয়ে যান।"

ওস্তাদজী ভেতরে গেলেন। মালতী উঠে প্রণাম করে তাঁকে কুশাসন পেতে দিলে। দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েকে মনে পড়ল, চাচা, এতদিন পরে!"

"মালতী মায়ি, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রায়নগর ছেড়ে গেলাম। সংসারে বিতৃষ্ণা হয়ে গেছল। যাকে বড় ভাল বাসতাম, যার উপর অনেক ভরসা ছিল, সে আমায় নিরাশ করলে। ফকীরী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সেই হতে আজ আঠার বৎসর পথে পথে ঘুরছি। মাস কয়েক আগে বৃন্দাবন গেছলাম। সেখানে হরিচরণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল। তোমাদের খবর তার কাছে অনেক পেলাম। মনে হল, মরবার আগে তোমাকে আর দেবারু বাবাকে একবার দেখে যাই। খোজ নিতে নিতে এসে পৌঁছেছি।"

"ঠিক সময়ে এসেছেন, ফকীর সাহেব! আর কিছুদিন পরে এলে আর ভাইঝিকে দেখতে পেতেন না। রায়নগর গেছলাম কাকা। মনে বড় দাগা লেগেছে। কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না। দেবারু, বাবা তোমরা একবার বাহিরে বস ত। আমার ওস্তাদজীর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

ছেলেরা বাহিরে গেলে পর মালতী বললে, "ফকীর সাহেব, দেবারু, এখনও বাপের নাম জানে না।"

"সে এখন বড় হয়েছে, তাকে বলবে না?"

"জিজ্ঞাসা করব সে জানতে চায় কি না। বড় ভয় করে, ফকীর সাহেব। শুনলে সে যে কি করবে তার ঠিক নেই। আমাকে এত ভালবাসে, যে সে তার বাপকে ক্ষমা করতে পারবে কি না সন্দেহ। আপনি রায় নগরের এখনকার খবর কিছু জানেন?"

"হ্যাঁ, মায়ি। কতক কতক জানি। তবে হরিবাবু রাজবাড়ীর নিমকহালাল চাকর, তার পক্ষে সব কথা বলা ত সম্ভব নয়!"

"তা হলে আমি যা দেখে এলাম, শুনুন," ব'লে রায়নগরে যা যা দেখে এসেছে সব বর্ণনা করলে।

ফকীর গালে হাত দিয়ে বসে সব কথা শুনলেন, তার পর উঠে মালতীর মাথায় হাত রেখে বললেন, "মায়ি, তোকে কত অপমানই না সহ্য করতে হয়েছে! গরীবের কেউ নেই এ দুনিয়াতে, এক দুনিয়ার মালিক বই! তাঁকে সর্ব্বদা ইয়াদ রাখিস, দুঃখকে দুঃখ বলে মনে হবে না।

রাজাবাবুর এই হাল হবে জানা উচিত ছিল আমার। তার মনে ত একটা জোর ছিল না কোন দিন। হালকা চরিত্র, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই ওদের ধর্ম্ম। তবে তুই কাছে থাকলে হয়ত ওর এ অধঃপতন হত না।"

"সেটা কি হতে পারত, বাবা?"

"তা পারত না, জানি। বৌরাণীর সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে কাড়াকাড়ি করা তোর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। আর, তোরা হিন্দু, রাজাবাবু তোকে বিয়ে করতে ত পারত না। গণ্ডগোল বেড়ে যেত বই কমত না। আল্লা যা করেছেন ভালর জন্যই।"

"না, আমার কোন আপশোশ নেই, ফকীর সাহেব, নিজের জন্য। ভগবান্ আমাকে অনেক দয়া করেছেন। তবে রাজাবাবু, রাণীমা, এঁদের জন্য বড় দুঃখ হয়। বিশেষ রাণীমার জন্য। কি উদার তার মন! এতটুকু ছোটপনা কোথাও নেই।"

মালতীর চোখে জল দেখে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললেন, "থাক, মালতী, ও সব কথা। ছেলেকে ডাক্। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে যাই।"

দেবারু এলে ফকীর তার সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন। মালতী ততক্ষণ চোখ বুজে বিশ্রাম করতে লাগল। খানিক পরে আহমদ সাহেব উঠলেন, "মায়ি, আমি তবে যাই এইবার। তোদের দেখে যে কত আনন্দ পেলাম তা বলতে পারি না।"

মালতী বললে, "আমার গোবিন্দকে একটী গান শুনিয়ে যাবেন না, ফকীর সাহেব? তাতে কিছু দোষ হবে কি?"

"দোষ? না, মালতী। আমি সুফী ফকীর, আমার কাছে সব দেবতাই এক। আয় দেবারু, গানটা শিখে নে। সে দিন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর সামনে এক বৈরাগী গাইছিল, দেশ রাগে। যেমন মিঠে কথা, তেমনি মিঠে সুর।"

আহমদ সাহেব গাইলেন,

"অমল কুন্দ হসনু মন্দ
নটবর ছবি তোরি।
নটবর ছবি তোরি কান্হাইয়া, নটবর ছবি তোরি।"
পীত বসন মুরলী অধর

মোর পিছ মুকুট লসিত
চন্দন কী গোর তিলক
দেখত ছবি তোরি ।
দেখত ছবি তোরি কানহাইয়া, দেখত ছবি তোরি ।

একবার গাওয়া হয়ে গেলে, দেবারুকে বললেন, "এইবার বাবা, তুইও ধর আমার সঙ্গে ।" তখন দুজনে ধরলেন,

"অমল কুন্দ হসনু মন্দ
নটবর ছবি তোরি ।"

মালতী একদৃষ্টে গোবিন্দের মুখের পানে তাকিয়েছিল। বলে উঠল, "ঐ দেখ্, দেবারু, মন্দ মন্দ হাসি ।"

গান শেষ হলে বৃদ্ধ ফকীর উঠলেন। সকলের মাথায় হাত রেখে দুয়া করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

দেবারু, শম্ভুর খাওয়া হয়ে গেলে মালতী তাদের ডেকে কাছে বসালে। দেবারুর হাত ধরে বললে, "তুই ত বড় হয়েছিস্, বাবা। এইবার মাকে ছুটী দে। আমার বুকের ভেতর কেমন করছে। কোন্ সময় হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবে। যা বলবার আছে আমার, এই বেলা বলে নিই। দেবারু, তোর বাবার নাম জানতে চাস্? যদি জানতে চাস, ত গোবিন্দের মুখের পানে চেয়ে আমাকে বল, যে তিনি যেমনই হোন তাঁকে তুই ভালবাসতে, ভক্তি করতে, পারবি ।"

দেবারু ঘাড় নাড়লে, "না মা, আমি জানতে চাই না। যত দূর বুঝতে পারছি, আমার বাবা তোকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছেন, আর

তুই যে আজ প্রাণ দিচ্ছিস. সেও বাবার জন্য। তাঁর নাম জেনে আমার কি লাভ হবে! তাঁর মুখ আমি দেখতে চাই না।"

"আচ্ছা, বাবা, জেনে কাজ নেই। আমার গোবিন্দ রইলেন, তিনিই তোকে দেখবেন। তাঁর নিত্য পূজার কি হবে?"

"আমিই করব, মা। তোর কাছে যেমন পূজা মাঝে মাঝে করি, তেমনই করলেই ত হবে?"

"তা খুব হবে, দেবারু। তবে যদি কাজ কর্ম্ম করতে অন্য দেশে যাস্, ত কি হবে?"

"যেখানে যাব, গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"সেই ভাল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, যে আমি চলে গেলে তুই এখানে থাকতে পারবি না। তা না পারিস্, থাকিস্ না। বাড়ী, জমী, সব শম্ভুকে দিয়ে যাস্।"

শম্ভু কাঁদতে লাগল, "মাসী, তুইও যাবি, দাদাও দেশান্তরে যাবে, ত আমি একলা থাকব কি করে?"

"তা থাকতে হবে বই কি, শম্ভু! তোর দাদা যেখানেই থাকুক, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে তোকে। দেবারু, শম্ভু, এইবার আমাকে বিদায় দে দুজনে। আর, গোবিন্দকে আমার মাথার কাছে নামিয়ে রাখ্।"

ছেলেরা দুজনে কাঁদতে কাঁদতে পায়ের ধুলো নিলে। তারপর দেবারু মূর্ত্তি নামিয়ে মায়ের মাথার কাছে রাখলে। মা আস্তে আস্তে চোখ বুজলে। ছেলেরা পায়ের কাছে বসে রইল। কখন যে প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে গেল তা তারা বুঝতে পারলে না।

—তের—

রাত্রি বারোটা। শম্ভু ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবারু গোবিন্দের সামনে বসে ওস্তাদজীর সেই গান গাইছে। এমন গাইছে যেন শ্রান্তি নেই। থামবার সাহস হচ্ছে না। ভয় করছে যে থামলেই সে ভেঙ্গে পড়বে। হঠাৎ, শুনতে পেলে বাহিরে থেকে তার গানের জবাব। কে গাইছে,

"চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী।"

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দেবারু উঠে দরজা খুলে দিলে। দেখে একজন তলপীদার দাঁড়িয়ে, তার পেছনে আধ-বয়সী একটী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের গোঁপদাড়ী কামান, কপালে তিলক, মাথায় নামাবলী বাঁধা। মৃদু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "চন্দনকী গোর তিলক, কে গাইছিল, বাবা?"

"আজ্ঞে, আমি গাইছিলাম।"

"তুমি এত সুন্দর গাইতে পার! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, মনে হল, এ রকম স্থানে কে এমন গায়, খবর নিতে হবে। তা তোমার নাম কি, বাবা? কাকে গান শোনাচ্ছিলে এত রাত্রে?"

"বাবাজী, আমার নাম দেবারু ঢুলে। আমি গান গেয়ে আমার মায়ের গোবিন্দের পূজা করছিলাম।"

"আমাকে একবার ঠাকুর দেখাবি, বাবা? তোর মার অসুবিধা হবে না ত?"

দেবারু চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিলে, "আমার মা আজ দুপুরে

মারা গেছেন, ঠাকুর। ভেতরে আসুন, গোবিন্দ দরশন করবেন।"

বাবাজী গোবিন্দকে প্রণাম করে বসলেন। বসে বললেন, "একবার তোমার গানটী শোনাও ত, দেবারু।"

দেবারু বসে জোড় হাত করে গোবিন্দের মুখের পানে চেয়ে গাইলে,

"অমল কুন্দ হসনু মন্দ
নটবর ছবি তোরি।"

গোসাঁই একটুক্ষণ ভেবে বললেন. "দেবারু, কীর্ত্তন শিখবি আমার কাছে? দুই বৎসর লাগবে। আমার নাম নিত্যানন্দ গোসাঁই, বাড়ী নবদ্বীপ।"

"হ্যাঁ বাবাজী, যাব যদি এক্ষণই নিয়ে যাও। আমি এখানে এক দণ্ডও টিকতে পারছি না। চারিদিকে মাকে দেখতে পাচ্ছি।"

শম্ভুকে জাগিয়ে বললে, "ভাই আমার ডাক এসেছে। আমি চললাম। বেঁচে থাকি দুবছর বাদ দেখা হবে। মায়ের হুকুম মনে আছে ত? জমী বাড়ী, ঘরদোয়ার. সব তোর জিম্মায় রইল।"

শম্ভু একটীও কথা কইলে না। দেবারুর দু পায়ের ধুলো নিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। দেবারু এক থলিতে গোবিন্দমূর্ত্তি নিয়ে, মাথায় গামছা বেঁধে, কোমরে একখানা ধুতি জড়িয়ে গোসাঁইকে বললে, "চলুন, বাবাজী।"

গোবিন্দদাস

দেবাকুর দু বছরের শিক্ষানবীসী শেষ হয়ে গেল আজ। গোসাঁইজী তাকে নিয়ে খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করে এলেন। এসে গলায় নূতন কন্ঠী পরিয়ে দিয়ে মাথায় নামাবলী বেঁধে দিলেন। দেবাকু ছল ছল চোখে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। আজই সে নবদ্বীপ ছেড়ে যাবে। কোথায় যাবে, ভুলুয়াতে? সেখানে তার কে আছে? গুরু মাথায় হাত রেখে বললেন, "বৎস, আমার যা বিদ্যা ছিল, তোকে নিঃশেষে দান করেছি এই দু বছরে। কিন্তু সে যে কতটুকু, তা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। তুই তোর গোবিন্দকে জন্মাবধি চিনেছিস্। তোর পরম পুণ্যবতী মা তোকে চিনিয়ে দিয়েছেন। সেই গোবিন্দের শ্রীচরণেই তোকে আবার উৎসর্গ করছি। আজ থেকে তোর নাম রইল গোবিন্দদাস। যা, বৎস! সবাইকে অমৃত কথা শোনাগিয়ে। তোর মুখে নাম গান শুনে পাথরও গলে যাবে।"

মাথায় নামাবলী বেঁধে নূতন গোসাঁই গুরু পত্নীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর শিষ্যের দাড়ী ধরে চুমো খেয়ে বললেন, "তোকে তোর মায়ের কোল থেকেই এক

রকম তুলে নিয়েছিলাম, দু বছর আগে। আজ তোকে ছেড়ে কি করে থাকব জানি না। তোকেই বা এই বিশাল সংসারে একলা ছেড়ে দেব কি করে? তবে গোসাঁইজী কেবলই বলেন, দেবারুর জন্য ভাবনা কোরো না গিন্নী, তার গোবিন্দ তাকে দেখবেন। তাই যেন হয়, বাছা। জয় রাধে গোবিন্দ!" দেবারু তাঁর পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নবদ্বীপের গোসাঁই পাড়ায় সবাই তাকে ভালবাসতেন। কিন্তু কণ্ঠী পরে নূতন নামাবলী বেঁধে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে দেবারুর বড় লজ্জা করতে লাগল। তাই সে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পানসী চড়ে দূরে চলে গেল। পানসী ছাড়বার আগে সবাইকার উদ্দেশে ভুঁইয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

একদিন সূর্য্যাস্তের সময় ভুলুয়া পৌঁছল। নদীর পারের ঘরটী তেমনি আছে। দূর থেকে ডাকলে, "শম্ভু!" দৌড়ে বেরিয়ে এল শম্ভু যেন পথ চেয়ে বসেছিল।

"কে দাদা, এসেছ?" বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। "এস দাদা, ঘরে উঠে এস। কি করে যে এই দু বছর কেটেছে ভগবানই জানেন। কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি, দাদা, যেন দেবতার মতন!"

দেবারু অন্যমনস্ক। কুটীরের পানে সোজা চেয়ে রয়েছে। মুখে কথা নেই। শম্ভু কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, আমাকে ভুলে গেছ? আমি তোমার ছোট ভাই শম্ভু।"

এবার দেবারু কথা কইলে, "না, ভাই ভুলব কেমন করে? তুই কি ভোলবার জিনিস! তোর বড় মনে কষ্ট হয়েছিল, না রে শম্ভু? কিন্তু

থাকতে পারলাম না ভাই! মাকে ছেড়ে এই ঘরে থাকতে পারলাম না। হয়ত আজ গোবিন্দের কৃপায় পারব। আয় ভাই, ঘরের ভিতর" বলে শম্ভুর গলা জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকল।

শম্ভু জিজ্ঞাসা করলে, "গোবিন্দ কই, দাদা?"

"এই যে, শম্ভু" বলে ঝুলি থেকে ঠাকুর বের করে সেই পুরানো কুলুঙ্গীতে রাখলে। কুলুঙ্গীতে দু বছর আগের শুকনো ফুল পড়েছিল। তুলে নিয়ে নিজের মাথায়, শম্ভুর মাথায় ঠেকালে। "বল্ শম্ভু, জয় রাধে গোবিন্দ।"

শম্ভু জোড় হাত করে বললে, "জয় রাধে গোবিন্দ!"

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর শম্ভু দাদার কাছে সব বলতে লাগল, বিষয় কর্ম্মের উন্নতি সে কি কি করেছে, চাষ-বাস কি রকম বাড়িয়েছে। দাদা খানিকক্ষণ শুনে বললে, "বেশ করেছিস ভাই। তুই লক্ষ্মী ছেলে। ঠাকুর তোর ভাল করবেন। আমাকে কিন্তু শম্ভু ছেড়ে দিতে হবে, শীগগীর।"

"যাবে! আবার তুমি আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে, দাদা?"

"হ্যাঁ ভাই, আমাকে যেতেই হবে। আমার গুরুর আদেশ, দেবতার আজ্ঞা, সবাইকে মধুর কৃষ্ণনাম শোনাতে হবে। ঘরে বসে কি করে থাকব বল্। তুই ত এখন বড় হয়েছিস্। ঘর সংসার তুই দেখবি।"

"তাই ভাল, আমিই দেখব সংসার, দাদা। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো, যেন একদিন তোমার সঙ্গ নিতে পারি। যখন কালই চলে যাচ্ছ, একবার আজ রাত্রে আগের মতন গোবিন্দের পূজা কর। আমি দেখি।"

দেবারু কিছু না বলে, কুলুঙ্গীর সামনে জোড় হাত করে বসে আস্তে আস্তে গান ধরলে,

বঁধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

একবার, দুবার তিনবার গাইলে। যেন বিশ্বসংসার ভুলে গেছে গায়ক। কখন চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কখনও বা আনন্দের ছটায় মুখ আলো হয়ে উঠছে! গাঁয়ের লোক সেই মধুর তান শুনে বলাবলি করতে লাগল, "মালতীর ঘরে এমন গান কে গায় আজ!"

সবাই দৌড়ল সেই দিকে। সকলের আগে বৃদ্ধ নায়েব সীতানাথ সরকার। যখন তিনি পৌঁছলেন ঘরের দোরে, দেখলেন একজন যুবা বৈরাগী দাঁড়িয়ে দু হাত বাড়িয়ে বিভোর হয়ে গাইছে,

"ওগো, তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।"

সামনে কুলুঙ্গীতে বংশীধারী মূর্ত্তি। গাইতে গাইতে বৈরাগী নাচতে লেগে গেল! কীর্ত্তন অনেকেই আগে শুনেছে, ভাব লাগাও দেখেছে, কিন্তু এ কি নাচ!

নাচতে নাচতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৈরাগী এক একবার ডেকে উঠছে, "বঁধু, বঁধু গো!" কি কাতর সে ডাক! সকলের চোখেই জল, সকলেরই বুকের ভেতর কি রকম করছে, যেন বুক ফেটে যাবে।

এত লোক যে ঘরে এসেছে, বৈরাগীর সে খেয়াল নেই। সে হঠাৎ গোবিন্দমূর্ত্তি কুলুঙ্গী থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে।

"জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হইও তুমি," চাপা গলায়

গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খানিকক্ষণ সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতন রইল। তারপর সীতানাথ ডাকলেন শম্ভু! শম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে।

"কে গাইছিল রে?"

"চিনতে পারেন নেই, নায়েব বাবু? আমার দাদা। এই একটু আগে এসে পৌছেছেন।"

"কোথায় গেল, বল দেখিনি।"

"আমি ত জানতে পারি নেই কখন বেরিয়ে গেল! মাসী এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ কোণটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। দাদ বোধ হয় তার পিছু পিছু গেছে। আমি যাই দেখিগে।" বলে শম্ভু বেরিয়ে গেল।

মাসীর আবির্ভাবের বার্ত্তা শুনে নায়েব প্রমুখ গাঁয়ের লোক আস্তে আস্তে সরে পড়ল। সাধ করে প্রেত-যোনির সংশ্রবে কি কেউ থাকতে চায়!

শম্ভু অনেক ঘুরে ঘুরে দাদাকে দেখতে পেলে নদীর ধারে। ব আছে, বুকে গোবিন্দকে চেপে। আপন মনে কি সব কথা কইছে তিন চার বার ডাকতে সাড় ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলে "কি বলছি রে, শম্ভু?"

"দাদা, তুমি কি মাসীকে দেখতে পেয়েছিল?"

"হ্যাঁ ভাই, মায়ের পিছু পিছুই ত এখানে এসেছি। ঐ ঐখানা আকাশের কোণে মা মিলিয়ে গেল। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল মাকে! মুখ থেকে যেন একটা আলোর ছটা বেরোচ্ছিল, যেমন আম

গোবিন্দের বেরোয়। আমার মাথায় হাত রেখে মা বললে—হ্যাঁ বাবা তুই যা, সবাইকে মধুর হরিনাম শোনা। আমি কাল সকালেই যাই তাহলে, শম্ভু ? দুঃখ করিস না ভাই।”

“না আমি দুঃখ করব না। যার যা কাজ এ জগতে ! কিন্তু ছোট ভাইকে একেবারে ভুলে যেও না, দাদা। মাঝে মাঝে দেখা দিও।”

পরদিন ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে দেবারু আবার ভুলুয়া ছেড়ে পথে বেরোল।

—দুই—

সেই থেকে আজ পাঁচ বছর গোবিন্দদাস ক্রমাগত দেশ বিদেশে ঘুরছে। সারা আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, হেঁটে হেঁটে ফিরেছে। পথের ধারে, মন্দিরের প্রাঙ্গনে, গৃহস্থের বাড়ীতে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-নাম গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছে। ভক্ত গৃহস্থ ধরাধরি করলে দু পাঁচ দিন এক জায়গায় থাকে, নইলে তৃতীয় দিনে ডেরা তোলাই তার অভ্যাস। সে যে গান গায়, তার সঙ্গতের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গী কেউ নেই, একা একাই পথ চলে। পাঁচ বছর এই রকম রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে নানা রকম কষ্ট সহ্য করেও তার মুখশ্রী যেন আরও উজ্জ্বল হয়েছে। দীর্ঘ ঋজু দেহ, কোথাও এতটুকু স্থূলতার চিহ্ন মাত্র নেই। দীর্ঘ বাহু, বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি, পথে যেতে লোকে বার বার তার দিকে ফিরে চায়। নবদ্বীপে মাথা মুড়িয়েছিল; এখন লম্বা চুল রেখেছে, তার উপর নামাবলী বাঁধা। অঙ্গে একটা গেরুয়া চাদর জড়ান। পথ চলে মাটির দিকে চেয়ে, গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে। ডান হাতে এক সরু লম্বা লাঠি। বাঁ কাঁধে ঝুলি। সেই ঝুলির ভেতর তার গোবিন্দ, আর খান কয়েক পুঁথি। কাউকে দেখায় না তার গোবিন্দ। দেখাতে প্রাণ চায় না। রাত্রি বেলা নিরিবিলি তার দেবতাকে বার করে সামনে রাখে। রেখে, কত কথাই কয় তাঁর সঙ্গে।

পুঁথিগুলি অধিকাংশই ভজনাবলী ও পদাবলী। একখানা গীতাও আছে। সেখানা সংগ্রহ করেছিল গোবিন্দের কথামৃত জেনে। কিন্তু বুঝতে

পারত না মোটেই। কাশীতে এক বৈদান্তিক পণ্ডিতজী বৈরাগীর ভজন শুনে খুশী হয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিন কয়েক খুব আদর যত্ন করেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে ভরসা পেয়ে বৈরাগী অনুরোধ করে, গীতা শোনাতে হবে। পণ্ডিতজী শোনালেন। বড় মিঠে লাগল। কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন, বেচারা গোবিন্দদাস সহ্য করতে পারলে না। কানে আঙ্গুল দিয়ে পালাল। সেই থেকে আর গীতা পড়তে সে কোন দিন চেষ্টা করে নেই। তুলসী চন্দন দিয়ে প্রতিদিন ভক্তি-ভরে পূজা করে।

আজ বছর দুই হল বাঙ্গালা দেশে এসেছে। এখানে কেউ আগ্রহ করলে কীর্ত্তনের পুরো পালাও গায়। কিন্তু খোলের সঙ্গে গাওয়া তার অভ্যাস নেই। ধুয়ো ধরার লোকও তার দরকার নেই। একা একা নেচে নেচে গায়। লোকের ভাল লাগলে নাচ সারারাত চলে। বৈরাগীর শ্রান্তি নেই। লাগেও লোকের ভাল। চাষাদের ত কথাই নেই। সে বেচারারা আর খোলের বড় বড় তালের মর্ম্ম কি বুঝবে? কিন্তু অনেক বিদ্বান্ বড় মানুষও এই দরিদ্র বৈরাগীর মেঠো কীর্ত্তন মুগ্ধ হয়ে শুনত।

এই রকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দদাস এসে উপস্থিত হল রায়নগর বলে এক ছোট শহরে। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এ গাঁয়ের নাম কি?"

"গাঁ কি হে, ঠাকুর! মস্ত শহর, নাম রায়নগর। এখানকার রাজাদের নাম শোন নেই?"

হঠাৎ দেবারুর মনে পড়ল যে তার মায়ের জন্মস্থানও ত এক রায় নগর। সেখানেও ত রাজা রাণী ছিল। ফকীর মারা যাওয়ার পর তার

মা কি এই রাণীর কাছে এসেছিলেন? ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এ রাজ্যের রাজাবাবু কে?"

"রাজা ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। বছর খানেক হল তাঁর কাল হয়েছে। এখনকার রাজা তাঁরই ছেলে। বয়স খুব অল্প।"

"রাণীমা আছেন কি?"

"আছেন বই কি! তিনিই ত যথার্থ জমীদার। তুমি কোথায় যেতে চাও, বাবাজী? রাজবাড়ী গেলে মোটা রকম বিদায় পেতে।"

"না বাবু, আমি ভিখারী বৈষ্ণব। মোটা বিদায় নিয়ে কি করব? আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল আবার পথ চলতে আরম্ভ করব।"

"আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে। আমবাগানে ধর্ম্ম-শালা আছে, দেখি দিই।"

ভদ্রলোক বৈরাগীকে নিয়ে গেলেন আমবাগানের সেই পুরানো পরিচিত মেটে বাঙ্গলার লাগা এক চালাতে। পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। মেটে বাঙ্গালা এখন খালী পড়ে আছে। চাকরদের থাকবার চালাটাকে রাণী পথিকদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

বৈরাগী স্থির হয়ে বসে, গোবিন্দ মূর্ত্তি সামনে রেখে, চিন্তা করতে লাগল। এখানে এসে অবধি তার মনটা বড় অস্থির হয়েছে। কিছুতেই অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারছে না। তার মার জন্ম স্থান! তা বেশ ত, কিন্তু মন এত উচাটন হচ্ছে কেন? একাগ্র হয়ে জোড় হাতে তার দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলে, "বল ঠাকুর, কেন আমার মনে এই অশান্তি এল। কেন আমার বুকের ভেতর এমন করছে?"

ঠাকুরের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুর ত তার কথা শোনেন, জবাবও ত দেন! অনেক বারই যে দিয়েছেন! কিন্তু আজ ত মনে কই কিছু আসছে না! "গোবিন্দ, রাগ করেছ আমার উপর?"

অর্দ্ধেক রাত্রি জল্পনায় কাটিয়ে, শ্রান্ত হয়ে বেচারা ঘুমিয়ে পড়ল। সে রাত্রি কিছু খাওয়া হল না। খাওয়ার কথা মনেও এল না বৈরাগীর।

ভোরে উঠে রাস্তায় বার হল। একটু দূরেই খামার বাড়ী। নায়েব বাবুর বাসার সামনে, "জয় রাধে গোবিন্দ," বলে মন্দিরা বাজিয়ে গাইতে আরম্ভ করলে,

সই, যমুনার কুলে কদম্বেরি মূলে
এসেছে দেখ লো কানু
সে যে, আমার লাগিয়ে পথ পানে চেয়ে
বাজায় অধীর বেণু॥

গান শুনে নায়েব সাধুচরণ বাহিরে এল। গোসাঁইয়ের মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "বাবাজী, তোমার নাম কি? কোথায় নিবাস?"

"বাবু, আমার নাম গোবিন্দদাস। বাড়ী কোথাও নেই। ভিখারী বৈষ্ণব আমি। এ গ্রামে কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি।"

"কোথায় এমন মন মাতান গান গাইতে শিখলে, গোসাঁই?"

"গোবিন্দের দাস, গোবিন্দই শিখিয়েছেন, বাবা।"

"আজ রাজাবাবুদের এই খামারেই থাক, গোসাঁই। সন্ধ্যার সময় দুটো গান শুনিও।"

"জয় হোক্ তোমার, বাবু। নাম গান করাই ত আমার কাজ। অনুমতি করেন ত গ্রামে একটু ঘুরে ফিরে আসি।"

"তা এস, বাবাজী। তোমার জন্য সিধে দেব, না আমাদের ঘরেই ভাত খাবে? আমরা কায়স্থ।"

"মা ঠাকরুণের প্রসাদ পাব, বাবু। আমার আবার জাত কি?"

সাধুচরণ বাড়ীর ভেতর গিয়ে স্ত্রীকে বললে, "বৌ, চারটী বেশী চাল নিও। ঐ গোসাঁই ছোকরাটী খাবে। বড় ভাল ছেলে।"

"তা বেশ ত। গান টান শোনাবে?"

"হ্যাঁ, বলেছি তাকে। সন্ধ্যার সময় গাইবে। পাঁচজন ভদ্রলোককে আসতে বলব। দেখ গিন্নী, ছোকরা একটা বড় ধোঁকা লাগিয়েছে। ওর চেহারা একেবারে হুবেহুব রাজাবাবুর মতন। ইদানীং তিনি বুড়িয়ে গেছলেন পাঁচ রকম বাড়াবাড়ি ক'রে, কিন্তু জোয়ান বয়সে নিশ্চয়ই এই গোসাঁইয়ের মত দেখতে ছিলেন।"

"আমি কি করে বলব, বল। রাজাবাবুকে ত কখনও দেখি নেই। গোসাঁইকে দেখলাম বটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। সুন্দর, রাজপুত্রের মতন চেহারা।"

এদিকে বৈরাগী গান গাইতে গাইতে সারা গ্রাম ঘুরছে। যেখানে যায়, লোকে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকায়, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে। কোথাও বা, সে চলে যাওয়ার পর তার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক লেগে যায়।

"চেনা মুখ, ভাই, একেবারে চেনা মুখ। অথচ বলে কি না, এখানে কখন আসে নেই আগে। কি গানই গায় ছোঁড়া! কি চেহারা!"

"আচ্ছা কার মতন দেখতে, বল্ দেখি, ভাই!"

"আমাদের রাজাবাবুর আদল আসে। তবে রাজাবাবুর ছিল কপাল কোঁচকান, চোখের কোলে কালী, কাঁচা-পাকা চুল, আর, এর উঠতি বয়স।"

"আচ্ছা ভাই, লোকটা বললে, ভিখারী, পথে পথে মেগে বেড়ায়, ওর অমন রঙ্গ হল কোথা থেকে? যেন জ্বল জ্বল করছে।"

খাওয়া দাওয়ার পর, বৈরাগী আমবাগানে গিয়ে মেটে বাঙ্গলার দাওয়ায় শুয়ে পড়ল। রাত্তিরটা বেশীর ভাগ জেগে কেটেছে, নায়েব গিন্নী খাইয়েছেনও খুব, শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক স্বপন দেখলে। ঐ দাওয়ার উপরই একটী জোয়ান বয়সের বাবু শুয়ে রয়েছেন চোখ বুজে, আর বাবুর মাথার কাছে হাত জোড় করে বসে রয়েছে তার মা, মালতী। মা যেন বলছে, "ঠাকুর, আর কখন না বলব না, তুমি আমার বাবুকে বাঁচাও।"

বাবুটীর মুখের দিকে নজর পড়তেই দেখলে যে, চেহারা ঠিক তার নিজের মত। এক গা ঘেমে উঠে বসল বৈরাগী। ভাবতে লাগল, "এ কে? কার মাথার কাছে আমার মা অমন করে বসে রয়েছে দেখলাম! আমার মনটারই বা কি হল? এখানে এসে অবধি সোয়াস্তি নেই এতটুকু। গোবিন্দ, তুমি আমাকে ব'লে দাও। কাল থেকে আমাকে নিয়ে এ কি খেলা খেলাচ্ছ, ঠাকুর!"

চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "বুঝলাম। এই আমার বাবা, তাহলে! কিন্তু ঠাকুর, আমি ওঁকে প্রণাম করব না। যখন মা আমাকে শেখায় নেই বাবাকে চিনতে,

বাবাকে ভাল বাসতে, তখন আজ আর চিনে কি হবে! এই নিয়ে মন খারাপ করব না। মা ত শেষ দিনে বলতে চেয়েছিল বাবার নাম, আমিই শুনতে চাই নেই। বাবা মাকে কষ্ট দিয়েছিল সারাটা জীবন, তাই তার নাম শুনতে চাই নেই। আজও চাই না। গোবিন্দ! আমাকে ঘুরে ফিরে এখানে নিয়ে এলে কেন আজ? বাবার সঙ্গে পরিচয় করে দেবে ব'লে? তা বেশ, প্রভু, সখা, প্রাণ-বল্লভ. তোমার যদি তাই ইচ্ছা হয়, ত আমারও তাই ইচ্ছা।"

এই ব'লে উঠল। উঠে গিয়ে,খানিক দূরে এক গাছ তলায় বসে আপন মনে গান ধরলে।

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে।
চন্দ্র কোটি, ভান কোটি, কোটি মদন হারে॥
সুন্দর কপোল লোল, পঙ্কজ দল নয়ন।
অধর বিম্ব, মধুর হাস, কুন্দ কলি দশন॥
নব জলধর, তড়িতাম্বর, গলে বন মাল শোহে।
নীল চতুর্ভুজ প্রভু, জগজন মন মোহে॥

অনেকক্ষণ প্রাণ ভরে গেয়ে মনে শান্তি এল। চোখ চেয়ে দেখলে যে চারি দিকে কত সব লোক এসে বসেছে। তারা অধিকাংশই চাষা-ভূষো, কাছাকাছি ক্ষেতে কাজ করছিল, গান শুনে কাজ ফেলে পালিয়ে এসেছে। একজন বুড়ো বাগদী চোখ মুছতে মুছতে কাছে এগিয়ে এল। এসে বললে, "থেমো না গোসাঁই। আর একটু হরিনাম শোনাও। তোমার মুখে নাম শুনলে পুণ্য হবে। নইলে, হতভাগা বামুনগুলোকে পয়সা গুঁজছি আজ ষাট বছর, কখন মন্দ বই ভাল হয় নেই। এইবার একটা আমাদের

দেশের বাঙ্গলা গান গাও, ঠাকুর, যার কথা বুঝতে পারি।"

"তাই গাইব, সরদার, যা তোমাদের ভাল লাগে। কিন্তু আমাকে ঠাকুর বলে ডেকো না। আমি নিতান্ত মূর্খ, ভজন-পূজন কিছুই জানি না, জাতে দুলে।"

"কেন আমাদের ছলনা করছ, বাবাজী? ঐ দেবতার মতন রূপ কি আর আমাদের দুলে বাগদীর ঘরে হয়! আমাদের যে কন্দর্পের মতন রাজাবাবু ছিলেন, তিনিও তোমার কাছে হার মানতেন।"

বৈরাগী আর কিছু না বলে, মন্দিরা বার করে গাইতে লাগল,

আমি আর ত ব্রজে যাব না ভাই
যেতে প্রাণ নাহি চায়।
আমার ব্রজের খেলা সাঙ্গ হল
তাই এসেছি মথুরায়॥
আমি মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি
ব্রজের মাকে ভুলে গেছি।
তোমরা সবাই মা বলে ভাই
ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায়॥
ননি খেও গোঠে যেও প্রেম বিলায়ো গোপিকায়।
আর আমার মতন বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে ভাই কদম তলায়॥
বাজিও বাঁশী, বাঁশী রবে, ব্রজবাসীর মন ভুলায়ে॥

ইতি মধ্যে গায়কের চারিদিকে শ্রোতার ভিড় বেড়েই চলেছিল। সারা রায়নগর থেকে, এমন কি, রাজবাড়ী থেকেও লোক আসছিল।

তিন প্রহর বেলার সময়, এক দরওয়ান এসে সদর নায়েব বাবুকে

রাণীমার কাছে ডেকে নিয়ে গেল। যাওয়া মাত্র রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "নায়েব মশায়, তোমাদের ওদিকে নাকি একজন কে অসাধারণ গায়ক এসেছে!"

"আজ্ঞে, একটী বৈরাগী এসেছে। তাকে আমার বাড়ীতেই স্থান দিয়েছি। বড় মিঠে গলা। আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাসায় কীর্ত্তন গাইবে।"

"তুমি এক কাজ কর, সাধু বাবু। তাকে বল যে আজ রাজবাড়ীতেই কীর্ত্তন হবে। কাল তোমাদের পাড়ায় হতে পারে।"

"তাই বলব, মা। কীর্ত্তন উপরে আপনার মহলে হবে, না নীচে নাট-মন্দিরে হবে।"

"নাট-মন্দিরেই ভাল। সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে ত! আমাদের জন্য একধারে চিক বেঁধে দিও।"

"যে আজ্ঞে, রাণীমা।"

"খোল করতালের ব্যবস্থা যা করতে হয়, কোরো।"

"না মা, এ গোসাঁই খোল করতালের সঙ্গে গায় না। নিজেই মন্দিরা বাজিয়ে নেচে নেচে গায়।"

"আচ্ছা, তাই হবে। একটা কথা, নায়েব মশায়। গোসাঁই দেখতে কি রকম?"

"বড় সুন্দর চেহারা তার, মা। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। বয়স পঁচিশের বেশী হবে না। রঙ কাঁচা সোনা।"

"কারও মত দেখতে?"

নায়েব হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বললে, "মা, দাসের অপ-

রাধ নেবেন না। মুখশ্রী, গড়ন, হাসি, অনেকটা আমাদের স্বর্গীয় রাজাবাবুর মতন।"

"আমিও সেই রকম শুনেছিলাম, তাই তোমায় জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, তুমি এখন এস। সব ব্যবস্থা ঠিক মত কোরো।"

কথা কইতে কইতে রাণীর গলাটা কি রকম ভারী হয়ে আসছিল। নায়েব চলে গেলে পর একটু চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ডাকলেন, "সমর, ললিতা, তোরা এ দিকে আয়।"

সমরেন্দ্রকে পাঠক চেনেন। সেই এখন রায়নগরের নাবালক রাজা। বয়স উনিশ কুড়ি। বেশ বুদ্ধিমান চেহারা, বলিষ্ঠ, তবে বাপের চেয়ে অনেক নিরেস। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছে, কিন্তু তার মা তাকে কলকাতায় কলেজে পড়তে পাঠাতে রাজী কিছুতেই হলেন না। তাকে কোন রকমের স্বাধীনতা এতটুকু কখনও দেন নেই। দেশ ভ্রমণে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যান। দেওয়ানজী জমীদারীর কাজ কিছু কিছু শেখান, তাও রাণীর সামনে ব'সে। মোটের উপর, ছেলেটীর প্রকৃতি বড় সুন্দর তবে এখনও একেবারে নাবালক। আসছে বছর জমীদারীর ভার নিতে হবে শুনলে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। বলে, "মা, তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।"

ললিতা রাণীর বোনঝি। সমরের বয়সী, তবে তার চেয়ে ঢের বেশী সপ্রতিভ। কলকাতায় ইংরেজী কলেজে পড়েছে। বেশ smart মেয়ে। ধরণ ধারণ পুরো মেম সাহেবী, তবে মাসীর বাড়ী এসে কতকটা ঢিলে দিয়েছে। এমন কি, আলতা পর্য্যন্ত পরে, এক এক দিন। চিরদিন টেবিলে সাহেবী কেতায় খেয়ে এসেছে। রায়নগরে আসনে

ব'সে খেতে গিয়ে চুড়ী বালা পর্য্যন্ত ঝোলে দালে ডুবিয়ে ফেলে। কাপড় চোপড় হাল ফেশনের, অর্থাৎ বিলেতে যে বছর যা ফেশন, তারই স্বদেশী সংস্করণ। বছর তিনেক আগে সাড়ীটা খুব খাটো করে পরত। এখন পরে গোড়ালী পর্য্যন্ত ঢেকে। জামার হাতা খাটো হতে হতে এখন আর নেই। জুতো সম্বন্ধে কিন্তু ললিতা সেকেলে, অর্থাৎ নাগরাও পরে না, মান্দ্রাজী চটীও পরে না, পুরো দু ইঞ্চি খুরো থাকা চাই তার জুতোর। সুন্দরী মেয়ে সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রঙ্গ, মুখশ্রী, গড়ন, সবই ভাল। তবে কেমন একটু লালিত্যের অভাব। মেম সাহেবদের মত কতকটা কাট খোট্টা। গোলাপফুলের পাপড়ীর মতন দুটী ঠোঁট, কিন্তু তার উপর নির্দ্দয় ভাবে রঙ্গ মাখান। বড় বড় পটল চেরা দুটী চোখ, কিন্তু নানা রকম বিলেতী ঢঙ্গের উপদ্রবে তার বাহারই খোলে না। ললিতার বাবার নাম মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। পেশা সিবিলিয়ানী। জেলার হাকিমী করেন। ছেলেবেলায় উৎকট রকমের সাহেব ছিলেন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, আর কতকটা জাত সাহেবদের অনাদরের ফলে, ইদানীং দেশের দিকে একটু মন ফিরেছে। চক্রবর্ত্তী সাহেব সুগায়ক ছেলে বেলা থেকে। যৌবনে ইংরেজী গানই বেশী গাইতেন। পরে ওস্তাদ রেখে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিখেছিলেন। এখন কীর্ত্তনের দিকে ঝুঁকেছেন। মেয়েকে ইংরেজী গান কখনও গাওয়ান নেই, হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনী শিখিয়েছিলেন। তার বেশ জোরালো গলা। তবে যেমন চেহারায়, তেমনই গলায়, মিষ্টতা কম। বাপের বড় সাধ, মেয়ে ভাল করে কীর্ত্তন গাইতে শেখে। ললিতা প্রথম প্রথম কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু বাপ অনেক বোঝানতে এখন রাজী হয়েছে শিখতে। বাপ

নিজেই গোড়া পত্তন করে দিয়েছেন। এখন একজন ভাল মাষ্টারের খোঁজ হচ্ছে। ললিতা মাসীকেও একথা জানিয়েছে।

রাণী হেসে বললেন, "ললিতা, তোর মাষ্টার ত জোগাড় হয়ে গেল। এইবার খুব কীর্ত্তন গাইতে শিখবি।"

"তাই না কি, মাসীমা? কে? কোথায় থাকেন তিনি?"

"অত ব্যস্ত হস্‌ না। আজ সন্ধ্যা-বেলাই দেখবি।"

সমর জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যি মা, আজ কীর্ত্তন হবে এখানে? কেউ ওস্তাদ গাইয়ে এসেছেন বুঝি!"

"না, বাবা, ওস্তাদ কেউ নয়, গোবিন্দদাস ব'লে কে একজন ভিখারী বৈষ্ণব এয়েছে। কিন্তু শুনছি বড় মিষ্টি গলা। কাল থেকে রায়নগরে রয়েছে। লোকে এরই মধ্যে তাকে নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। কি রকম গাইবে জানি না। খোল করতাল থাকবে না।"

"ও মা গো! মাসীমা, ঐ ভিখারী বৈরাগী আমায় গান শেখাবে! আমি ওকে কত বড় বড় তাল শিখিয়ে দিতে পারি।"

"তা হয় ত পারিস, ললিতা। কিন্তু এ জগতে কার কাছ থেকে কি শেখার আছে, তা কি বলা যায়। তোর বাবা ত বলেন যে তোর গানে একটা জিনিসের অভাব, মিষ্টতা। হয়ত এই গোবিন্দদাস সেটা দিতে পারবে। সমর, তোর মনে আছে, তোর যে সেই বংশীলালজী ওস্তাদ ছিলেন, তিনি তোকে ভজন শেখাবার সময় বার বার কেবল বলতেন প্রেমসে গাও ভাই, পিয়ারসে গাও? কীর্ত্তনে এই পিয়ারসে গাওয়াই যে সব!"

"হ্যাঁ মা, খুব মনে আছে।"

সন্ধ্যাবেলা নাটমন্দিরে আসর জমেছে। লোকে লোকারণ্য। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে। মাঝখানে রাজা সমরেন্দ্রের জন্য মসনদ পাতা। তার পেছনের দালানে চিকের আড়ালে মেয়েদের আসন। রাণী বসেছেন ললিতাকে পাসে নিয়ে। চারি দিকে গ্রামের ভদ্রলোকের মেয়েরা। অন্ত্যজ জাতের মেয়ে পুরুষের এ আসরে স্থান নেই। চৈতন্যদেব যে অনেক দিন মরে গেছেন! আবার তিনি যদি কখনও আসেন ত চণ্ডালকে কোল দেবেন। ভদ্র মণ্ডলী সবাই এসে আসর জমকে বসেছেন। এমন সময় নায়েব সাধুচরণ এক দীর্ঘকায় যুবককে নিয়ে ঢুকল। যুবক সকলকে নত হয়ে প্রণাম ক'রে এক পাসে বসল। তার পর বালক রাজা বাহাদুর এসে মসনদে বসলেন। সবাই তাঁকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলে। এক চাকর প্রকাণ্ড তাল পাতার পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লেগে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ হলে পর সমরেন্দ্র বললেন, "নায়েব বাবু, এইবার আরম্ভ হোক।"

সেই যুবকটী গায়ের চাদর খুলে রেখে, নিজের কাঁধে ঝোলান থলিটী সন্তর্পণে তার উপর রাখলে। মাথায় বাঁধা নামাবলীটী খুলে কোমরে বেঁধে আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কি সুন্দর মূর্ত্তি! এ কি পথের ভিখারীর চেহারা! সমরেন্দ্র বৈরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখের পলক পড়ছে না। এ কার মুখ? কার ঐ বিশাল বক্ষ, ঋজু দেহ, চাঁপাফুলের মতন বর্ণ! এ কি কেউ চেনা লোক! আবিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবাজী, তোমাকে কি আগে কখন দেখেছি! তুমি কি রায়নগরের লোক?"

"না রাজা বাবু, আমি বেগানা লোক। এখানে ত কোন দিন আসি নেই।"

"আচ্ছা, গান আরম্ভ কর, গোসাঁইজী।"

বৈরাগী ধরলে,

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী॥

গৌরচন্দ্রিকা হয়ে গেলে পর, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "জয় রাধে!" ব'লে আবার ধরলে, "কানু সে জীবন ধন মোর।"

যখন গাইলে,

যত ছিল অভিমান সতী কুলবতী নাম
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহ ত পরাণ সখী অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি
আন রঙ্গ লালে নাহি পায়॥

বৃদ্ধেরা সব আহা, আহা, করে উঠল। কত রকমে, কত কথায়, বৈরাগী শ্রীরাধার কলঙ্ক কাহিনী সবাইকে শোনালে! আসরসুদ্ধ লোক স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনতে লাগল সেই কাহিনী। তখন গোসাঁই ধীরে ধীরে নাচতে আরম্ভ করলে। ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে, গাইতে লাগল, "আমার কলঙ্কিনী রাই কিশোরী!" তার মাথার লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলি নাচছে। সমস্ত শরীরে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চক্ষু মুদিত, মুখে মৃদু হাসি।

বৈরাগী আসরে এসে দাঁড়ান অবধি রাণীমা কথা কন নেই।

অপলক চোখে তার পানে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর মনের ভেতর দিয়ে যে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা অন্যে কি বুঝবে? ললিতা অনর্গল ব'কে চলেছে। জবাব না পেলে চুপ করে যাওয়া তার অভ্যাস নয়। বরং তাতে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল।

"মাসীমা, কি মিষ্টি গলা লোকটার, কি গানই গাইছে!"

"কি সুন্দর চেহারা, মাসীমা! যেন মেসো মশায়ের আদল নয়?"

"আমি এর কাছেই গান শিখব। এমন মাষ্টার কোথায় পাব? বাবাকে কালই লিখে দেব, 'মাষ্টার পেয়েছি, এমন সুন্দর দেখতে!' কি বল, মাসীমা, দেরী করে কি হবে!"

"তুমি আমার কথা শুনছ না, রাণী মাসী। কি ভাবছ বল দেখি! লোকটাকে দিন দুই চার আটকে রেখে দিলে হয় না, বাবার চিঠি আসা পর্য্যন্ত?"

রাণী চোখ মুছে বললেন, "ললিতা, কীর্ত্তনের আসর কি গল্প করার জায়গা? চুপ করে শোন্।"

ললিতা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। পারবে কেন? আবার বক্‌বক্ করতে সুরু করলে, "পালাটা কিন্তু ভাল পছন্দ করে নেই। কলঙ্ক যদি সত্য হয়, ত তার আবার ভঞ্জন কি? রাধিকা যদি কলঙ্কিনীই হয়, ত তা নিয়ে গান করলেই কি লোকে তাকে সতী বলবে?"

রাণীর মুখ যেন ব্যথায় সাদা হয়ে গেল। বোনঝির দিকে ফিরে ধমক দিলেন। "তুই ছেলে মানুষ, চুপ কর ত। তুই ও সবের কি বুঝবি? গান শোন্ চুপ করে বসে।" এই কথা বলে ধীরে ধীরে রাণী

উঠে গেলেন। একটু পরে দাসী এসে খবর দিলে, "দিদিমণি! রাণীমার বড্ড মাথা ধরেছে, তিনি একটু শুয়েছেন। বললেন, যে গান যেমন চলছে চলুক, আর আপনি আসরেই বসে থাকুন।"

ললিতা কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না। মিনিট পনের পরেই সমরেন্দ্রকে বলে পাঠালে যে রাণীমার শরীর অসুস্থ, তিনি উপরে চলে গেছেন। সমর ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। উপরে গিয়ে দেখে মা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অসুখ করছে, মা?"

"না, বাবা, না। আমার কিছুই হয় নেই। তুই কীর্ত্তন বন্ধ করলি কেন? পালা শেষ হয়ে গেলে আমি একবার বৈরাগীর সঙ্গে কথা কইতে চাই। আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্ তাকে।"

"আর আমার গান ভাল লাগছে না, মা। আমি এখনই তাকে নিয়ে আসছি।" ব'লে সমরেন্দ্র নীচে চলে গেল।

—তিন—

একটু পরে সে গোবিন্দদাসকে উপরে নিয়ে এল। মায়ের ঘরের বাহিরে থেকে বললে, "মা, গোসাঁইকে এনেছি।"

মা ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন, "ভেতরে পাঠিয়ে দে।"

গোবিন্দ ভেতরে গিয়ে রাণীর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবারু, তোকে দেখেই আমি চিনেছি। ভাল আছিস্ বাবা?"

"আপনি আমাকে আগে দেখেছেন, রাণীমা!"

"হ্যাঁ বাবা, তুই যে ছোটবেলায় এই রায়নগরেই ছিলি!"

"সে কথা আমার মা আমাকে বলেছিল। আর এ কথাও বলেছিল রাণীমা, আমার প্রাণ ভিক্ষা আপনার কাছেই করতে এসেছিল। ভুলুয়ার নায়েব বাবুর কাছেও শুনেছি যে আপনি সদা সর্ব্বদা আমাদের খবর রাখতেন।"

"তা রাখব না, বাবা! মালতী যে আমার বোনের মতন ছিল।"

"কিন্তু রাণীমা, আমার মা এখান থেকে যখন ফিরে গেল, তার মন একেবারে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেছল। আর বিছানা থেকে উঠল না! কি করেছিলে তোমারা আমার মাকে, রাণীমা! তখন ছেলেমানুষ ছিলাম আমি। মাথায় এমনই রক্ত চড়ে গেল, একবার মনে হল, রায়নগরে যাই, গিয়ে, সব চুরমার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আসি।"

পলকের জন্য বৈরাগীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু তখনই

শান্ত হাসি হেসে বললে, "মা আমাকে তখনকার মতন মিষ্ট কথায় শান্ত করলেন। তার পর দু দিন বাদ যখন তিনি মারা গেলেন, আমাকে তাঁর গোবিন্দের চরণে সঁপে দিয়ে গেলেন। আমি গোবিন্দকে নিয়ে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়লাম। সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে। ঠাকুর দয়া করেছেন। আর আমার কারও উপর রাগ নেই, অভিমান নেই, রাণীমা!"

রাণী খপ করে বৈরাগীর হাত ধরে বললেন, "বাবা! যদি রাগ নেই তবে আমার কাছে থাক্ আজ থেকে। তোর মা নেই, কিন্তু মাসী ত রয়েছে। মাসীর কাছে থাক্, বাবা।"

"রাণীমা, এ গরীব ভিখারীকে রাজপুরীর গারদে কেন পুরবে? কেন তার ব্রত ভাঙ্গবে? তুমি গুরুজন, আশীর্ব্বাদ কর যেন সে জীবন-ভোর তার ব্রত পালন করতে পারে, সারা জগৎকে মধুর হরিনাম শোনাতে পারে।"

"রাজপুরীকে গারদ কেন বলছিস, দেবারু? এ যে তোর বাড়ী।"

"না, রাণীমা! আমার বাড়ী গাছের তলায়, মুক্ত হাওয়ায়। যবে থেকে মা গেছে, তবে থেকে সেই আমার ঘর বাড়ী হয়েছে।"

"দেবারু, যদি আমি বলি যে এই রাজ্য, এ রাজবাড়ী, সব তোর নিজের জিনিস, তাহলে বিশ্বাস করবি?"

দেবারু রাণীমার মুখের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "ঘুরতে ঘুরতে, অজানতে, এখানে এসে পড়েছিলাম, রাণীমা। তখন খেয়াল হয় নেই, যে এই আমার মায়ের রায়নগর। যখন বুঝতে পারলাম, মন বড় অস্থির, অশান্ত হয়ে উঠল। আকুল হয়ে আমার গোবিন্দকে ডাকতে

লাগলাম। তিনি দয়া করে আমার বাবার মুখ আমাকে দেখালেন। তুমি কি বলবে, রাণীমা, আমি আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু আমার ঠাকুর আমাকে ঐ ডাকছেন আবার পথে বেরিয়ে পড়তে!"

রাণী হতাশ হয়ে দেবারুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবা, আমার উপর দয়া করবি না! আমি যে তুষানলে পুড়ছি। মালতীকে কলঙ্কিনী করে অবধি এক দিন সুখ পাই নেই। সে আমায় ক্ষমা করেছিল। তুই রায়নগরের রাজবংশকে মাপ করবি না, দেবারু?"

"ক্ষমা কাকে করব, রাণীমা! তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি যে আজ থেকে আমার দুই মা। একজন দুলেনী, একজন রাজরাণী। গোবিন্দকে নিত্য বলব যেন তিনি তোমার মনে শান্তি দেন।"

"বাবা, আয় একবার তোকে চুমো খাই। আমার জীবন সার্থক হোক।"

তারপর রাণী ডাকলেন, "সমর!" সমরেন্দ্র ভেতরে এল। রাণী সজল চোখে বললেন, "সমর, এই গোসাঁই তোর বড় ভাই। পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর। আমি ওঁকে অনেক বলেছি এখানে থাকতে তোর জ্যেষ্ঠ, তোর অভিভাবক, হয়ে। তুই একবার বলে দেখ্!"

সমর দেবারুকে প্রণাম করে বললে, "তুমি সত্যি আমার দাদা! তাই তোমায় দেখে আমার মনটা অমন উদাস হয়ে গেছল। এখানে থাকবে না, দাদা? মার কথা রাখবে না?"

"সমরেন্দ্র, আমি তোমার ভিখারী দাদা। তুমি রাজ্যেশ্বর হয়ে থাক। আমি যেখানেই যাই, গোবিন্দের পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইব যেন

তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যেন জগতে জনক রাজার মত রাজর্ষি বলে তোমার খ্যাতি হয়।”

রাণী বিষণ্ণ মুখে বললেন, “তাই ভাল, দেবারু। কাছে না থাকিস, দূর থেকেই ছোট ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করিস্। সমর, তোর মালতী মাসীকে মনে আছে? সেই যে সাত বছর আগে এসেছিলেন আমার কাছে! তিনিই দেবারুর মা ছিলেন মনে রাখিস্ বাবা, তাঁর মত পুণ্যবতী সংসারে দুর্লভ।”

দেবারু তখন রাণীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, “মা, তাহলে আমাকে ছুটী দাও। জয় রাধে গোবিন্দ!” ব’লে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে বেচারা মা পেয়েছে। কিন্তু এমন তার অদৃষ্ট যে সেই মাকে চোখের জলে ভাসিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। “গোবিন্দ, কি আছে তোমার মনে? কেন বাবার মুখ দেখালে, স্নেহময়ী মা এনে দিলে, সমরের মত সোণার চাঁদ ভাইকে চিনিয়ে দিলে? আমাকে কি সংসারে বাঁধতে চাও? আর আমাকে তুমি চাও না? না, না, কি বলছি আমি! ঐ যে বাঁশী মুখে, দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ আড় নয়নে চাইছ। ও, বুঝেছি, পরীক্ষা করছিলে আমাকে; আচ্ছা বন্ধু, কর পরীক্ষা ভাল ক’রে। তোমাকে আমার দিব্য রইল। আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না, গোবিন্দ। তেমন মায়ের ছেলে নই আমি। বাঁশী বাজিয়ে ডেকে এনে ফিরিয়ে দিতে চাও! দুষ্ট ছেলে!”

এই সব ভাবতে ভাবতে সমরের সঙ্গে সিঁড়ি নামছিল। সিঁড়ির গোড়ায় দেখে একটী মেয়ে চৌকীতে বসে রয়েছে। দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েটী হেসে ছোট্ট একটী নমস্কার করলে। দেবারু খুব নত হয়ে প্রতি-নমস্কার

করে এগিয়ে গেল। কথা কইলে না। দোরের কাছে সমরকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আসি ভাই, সমর। বেঁচে থাক, প্রজার মা বাপ হও।"

সমর যখন আবার বাড়ী ঢুকল, ললিতা তখনও সেই চৌকীতে বসে। বললে, "লোকটা কি জেঁকো। আমার সঙ্গে কথাই কইলে না। আমি কিন্তু ওর কাছে গান শিখবই। নইলে গান শেখা ছেড়ে দেব।"

সমর অন্য মনস্ক ভাবে বললে, "এস ললিতা, মার কাছে যাই।"

—চার—

আবার ঘুরতে লাগল গোবিন্দদাস পথে পথে। ছ'মাস কেটে গেছে। রায়নগরের কথা সে ভোলে নেই, ভোলা সম্ভব নয়। তবে আর আগের মত মনে বেঁধে না দিবারাত্র।

একদিন সে রায়পুর শহরের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে গুন গুন ক'রে গাইতে গাইতে, "নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখী-পাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন হে!" এমন সময় এক লালপাগড়ী পাহারাওয়ালা এসে খপ্ করে তার হাত ধরলে। বৈরাগী আশ্চর্য্য হল। বঙ্গের বাহিরে তাকে অনেক বার থানায় যেতে হয়েছিল, কেবল বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছে ব'লে। কিন্তু তার নিজের দেশেও নিস্তার নেই! এখানেও বাঙ্গালী হওয়া পাপ!

সেপাই জিজ্ঞাসা করলে, "এই গোসাঁই, তোমারা নাম ক্যা হ্যায়? ঠিক ঠিক সে বতাও।"

"আমার নাম গোবিন্দদাস।"

"বস্, তব তো ঠিক হো গয়া। হুকুমমে লিখা হ্যায়—বৈরাগী, নাম গোবিন্দদাস, পচিস বরসকা জওয়ান, গোরা রঙ্গ, ছে-ফুট লম্বা আদমী, চওড়া ছাতি। চলো কোতওয়ালীমে।"

"কেন বাবা? আমি কি অপরাধ করেছি? কোতওয়ালীতে কেন যাব?"

"কেনো যাবো? সরকারকা হুকুম হ্যায়, ইস্ লিয়ে যাবো। অচ্ছী তরসে চলো, নহী তো পকড়কে লে জাউঙ্গা।"

"তা বেশ, সেপাইজী, চল। থানায় দারোগা বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব। তোমার মত বুদ্ধিমানকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করাই বৃথা।"

থানায় পৌছলে দারোগা হুঙ্কার ছাড়লেন, "রামখেলাওন সিং, তুমি একটী আস্ত গাড়ল। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, ওঁর হাত ধরে টেনে আনছ কি! ছেড়ে দাও জলদী।"

গোবিন্দদাসকে প্রণাম ক'রে বসিয়ে দারোগা আগে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারখানা কি হয়েছে।

"আগরপাড়ার জেলা-হাকীম চক্রবর্ত্তী সাহেব কোন কাজের জন্য আপনার সন্ধান করছেন। তিনি সব জেলায় এতেলা দিয়েছেন যে গোবিন্দদাস বৈরাগীকে পেলে যেন তাঁকে সম্মান করে আগরপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পথ-খরচা তিনি দেবেন। আপনি যেতে রাজী আছেন?"

"রাজী না হয়ে আর উপায় কি, দারোগা বাবু, যখন আপনাদের হাতে পড়েছি।"

"আপনার মত লোক আমাদের ভয় করবেন কেন? চোর, ডাকাত, বদমায়েশরা ভয় করে বটে।"

"দারোগা বাবু, আমি কিছু কিছু জানি পুলিসের ধারা। এক কালে চাকরী করতাম যে!"

"আপনি পুলিসে চাকরী করতেন! কি যে বলেন তার ঠিক নেই। যে চাকরী আপনি নিয়েছেন তার নমুনা কিছু দিতে হবে, মশায়। চলুন আমার বাসায়। দু চারটে কীর্ত্তন শুনে তবে আপনাকে ছাড়ব। আগরপাড়ার গাড়ী ভোর পাঁচটার সময়!"

পরদিন আগরপাড়া পৌঁছলে পর বৈরাগীর রক্ষী তাকে সোজা চক্রবর্ত্তী সাহেবের কুঠিতে নিয়ে গেল। তখন বেলা সবে আটটা। সাহেব বারান্দায় আরাম কুরসীতে কাং হয়ে শুয়ে রয়েছেন। মুখে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্মদেশীয় চুরুট। চাপরাসী এত্তেলা দিয়ে বৈরাগীকে ভেতরে নিয়ে এল। সাহেব সেই কাং অবস্থাতেই এক হাত তুলে একটা নমস্কার বা আদাব ক'রে বললেন, "বসুন। আপনার নাম গোবিন্দদাস গোসাঁই?"

দেবারু ভুঁইয়ে বসে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু। আমাকে তলব করেছিলেন কেন?"

"আপনার সঙ্গে আমার মেয়ে ললিতার পরিচয় আছে? সেই আপনাকে ডেকেছে। চাপরাসী, মিসি সাহেব কো সেলাম দেও।"

মিসি সাহেব এলেন। রায়নগরের ললিতা বলে চেনা কঠিন। পায়ে লাল টুকটুকে মখমলের চটী। গায়ে নীল বর্ণের জাপানী গাউন। এলো চুলে লাল রেশমের ফিতা বাঁধা। হাতে এক রূপো বাঁধান কাঁকুই। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা আমাকে এ অসময়ে ডাকাডাকি করছ কেন? জান না, আজ morning tennis, আমাদের সকালবেলা টেনিস খেলা আছে?"

"আচ্ছা, তুই একবার শোন্ না।" ললিতা বেরিয়ে এল।

গোবিন্দদাসকে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "Ah! Here is my truant minstrel—এই যে আমার পলাতক বৈরাগী! আমায় চিনতে পারছেন না বুঝি? আমি সেই রায়নগরের ললিতা, যাকে দেখে আপনি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছলেন। আমি কি ছাড়বার পাত্র নাকি! আপনাকে দেখেই ত প্রথম দর্শনে—excuse me,

daddy dear। যখন শুনলাম আপনি পালিয়েছেন আমারও জেদ চাপল। কেমন পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনিয়েছি! এখন বলুন, আমাকে কীর্ত্তন শেখাবেন ত!"

গোসাঁই নমস্কার করে বললে, "তা বেশ করেছেন, ধরে আনিয়েছেন, দিদিমণি! আমার এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। কিন্তু আমার ত কই আপনাকে কিছুতেই মনে পড়ছে না!"

"পড়বে কোথা থেকে? সেখানে যে আমি রাণীমাসীর বোনঝি ছিলাম, আর এখানে মিসি বাবা। তাহলে কাল থেকে গান শেখাচ্ছেন ত?"

"যে আজ্ঞে, দিদিমণি।"

ললিতা গুন গুন করে কি গাইতে গাইতে ভেতরে চলে গেল। বৈরাগীকে সত্যি ভাল লেগেছে, না শুধু একটা বড়-মানষী ঝোঁক? কে জানে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবাজী, কত টাকা মাইনে নেবে?"

গোবিন্দ জোড় হাত করে উত্তর দিলে, "টাকা ত আমি নেব না, বাবু। টাকা কি করব?"

"থাকবে কোথায়? খাবে কি?"

"ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, একটা কোন জায়গা দেখে নেব বাবু, থাকবার জন্য। খাওয়া! বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষা করে খাব।"

বার বার "বাবু, বাবু" করায় চক্রবর্ত্তী চটে যাচ্ছিলেন। একটু চড়া সুরে বললেন, "আমার মেয়ের মাষ্টার ভিক্ষা করে খাবে, সে ত আর হতে

পারে না। এখান থেকেই সিধা পাবে। চাপরাসী, গোসাঁইবাবুকো ধর্ম্মশালামে লে যাও। কাল সকাল আটটায় এসো, বাবাজী।"

বলতে বলতে ললিতা বেরিয়ে এল। গাউন-মণ্ডিতা। এক হাতে রঙ্গীন রেশমের সোয়েটার, অন্য হাতে ব্যাট। বললে, "আসুন গোসাঁইজী, আমি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ধর্ম্মশালায় যাবেন?"

চক্রবর্ত্তী সাহেব উঠে ললিতাকে এক পাসে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "Girlie, তুই সত্যি এই ভিখারীটার কাছে গান শিখবি?"

"কেন শিখব না! তোমার কেবল মনে হচ্ছে, যে লোকটার কাপড় চোপড় বিদকুটে, আর ইংরাজী বলতে পারে না। কিন্তু বাবা, ওঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না যে ওঁর কি রকম একটা Personality, বিশেষত্ব, আছে। Daddy dear, you are getting frightfully old fashioned—তুমি ভয়ানক সেকেলে হয়ে যাচ্ছ, বাবা। আমরা কি আজ কাল conventions—পুরোনো সংস্কারগুলোকে মানি। তোমার, আমার, গোসাঁইকে ভাল লাগে। বাস্, অন্যলোকে তাকে কি মনে করবে, না করবে, তাতে আমাদের কি?" ব'লে ললিতাদেবী সোয়েটারের ভেতর থেকে চাঁপাকলির মত আঙ্গুলগুলি বের করে সশব্দে এক তুড়ি দিলেন।

মোটার এসে দাঁড়াল। ললিতা বাপকে "So long, dear" বলে দেবারুকে ডাকলে, "আসুন বাবাজী। ধর্ম্মশালা আমার পথেই পড়বে।" দুজনে গাড়ীতে উঠে বসল।

ললিতার মা বেরিয়ে এলেন; তাঁর তখনও প্রসাধন হয় নেই। কেশ, বেশ, আলু-থালু। এই মাত্র বাবুর্চ্চীকে ঘি, মাখন, পনীর ইত্যাদি বের

করে দিচ্ছিলেন। গাড়ীর দিকে নজর যেতেই কর্ত্তার পানে কটমট করে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মেয়েটাকে কি বাঁদরই করছ! তোমার এতটুকু আক্কেল নেই। কোথা থেকে এই ভেকধারীটাকে জুটিয়ে দিলে, এখন ওর সঙ্গে মেয়ে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াক!"

"গিন্নী, কীর্ত্তন ত তুমিও ভালবাস। কীর্ত্তন শেখাবার জন্য ত আর মেম মাষ্টার পাওয়া যায় না।"

"তা নাই বা গেল? একটী সভ্য ভব্য ভদ্রলোক দেখে রাখলেই ত হত। আমাদের কাছে পিঠে থাকত। এক সঙ্গে খেত দেত।"

"সুন্দরী, বুদ্ধি তোমার অতি প্রখরা! সভ্য, ভব্য, সুদর্শন ছোকরা মাষ্টার রাখলে কি বিপদের আশঙ্কা নেই? হিন্দু ঘরে ত আর মেয়ের বিয়ে দেবে না!"

"তা ত দেবই না। বিয়ে থা নিজের class এই (জাতেই?) হওয়া উচিত। একটু বুড়ো-স্বড়ো গোছের ভদ্রলোক মাষ্টার আনলেই ত চুকে যেত। তাহলে কোন কথা থাকত না।"

"গিন্নী, তুমি সব কথাই ভেবে দেখেছ, কেবল এই সামান্য কথাটা ভুলে যাচ্ছ যে মাষ্টারের পেটে বিদ্যা থাকা চাই। যে কীর্ত্তন ভাল গাইতে পারে এমন লোক নইলে কীর্ত্তন শেখাবে কি করে? Girlie এই বাবাজীর গান শুনেছে, খুব ভাল লেগেছে, তাই ত ওঁকে আনিয়েছি। আচ্ছা, তুমি মেয়েটাকে না হয় বারণ করে দিও যে বৈরাগীর সঙ্গে পথে ঘাটে ঘুরে না বেড়ায়।"

একটু পরে ললিতা টেনিস খেলে এক গা ঘেমে, মুখ লাল করে ফিরে এল। মা বারান্দাতেই ছিলেন, মেয়েকে কাছে ডাকলেন। বৈরাগীর

সঙ্গে ঘুরে বেড়ানর কথা বলতেই ললিতা ভয়ানক মুখনাড়া দিয়ে উঠল, "ম্যামি, তোমার হিন্দুসমাজে পরদার আড়ালেই থাকা উচিত ছিল। কুড়ি বছরের বুড়ো মেয়ে, সে কার সঙ্গে বেড়াবে, না বেড়াবে, সেটা ঠিক করা কি তোমার কাজ ?"

সেকেলে লোক বললে মিসেস চক্রবর্ত্তী ভীষণ রেগে যেতেন। গোঁড়া বনেদী ঘরের মেয়ে তিনি, তাঁর সিবিলিয়ানের মেম' হয়ে ফিরিঙ্গীয়ানা শিখতে অনেক কসরৎ করতে হয়েছিল। নাকে একটা বড় ছেঁদা ছিল, নথ পরার জন্য। সেটাকে বোজাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নেই। লোকে বলে, কপালে একটা উলকীও ছিল। সেটা এখন দেখা যায় না। কপালের মাঝখানে একটা খুব পুরানো অস্ত্রাঘাতের দাগ আছে মাত্র। বাহিরের উলকীটা গেছে কিন্তু মনের উলকী ত যাওয়ার নয়। তিনি মেয়ের কথায় চটে উত্তর দিলেন, "অবশ্য আমার কাজ। তোমার বেলেল্লাপনায় আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

"তা দিও না মা, দিও না। কিন্তু ঐ ছোকরা চাটারজীকে আমি বিয়ে করছি না। তার চেয়ে আমার গোসাঁই ঢের বেশী interesting, attractive। যাক্, আমার এখন সময় নেই তর্ক-বিতর্ক করবার। আমাকে ছেড়ে দাও, মা। স্নান করে বাবার সেই লেখাগুলো নকল করতে বসব।"

"তা যা না। আমি ত আর ধরে রাখি নেই। কিন্তু ও বৈরাগীকে নিয়ে গাড়ী চড়া হবে না। আমার হুকুম। বুঝলি ?"

"তোমার গাড়ী সম্বন্ধে তুমি হুকুম অবশ্য করতে পার। কিন্তু যা

আমার নিজের, তার সম্বন্ধে তোমার হুকুম চালাতে যেও না। আমিও বলে দিলাম, মা।" বলে ঘাগরাটা খুব নাড়া দিয়ে, পা ঠুকে, ললিতা ভেতরে চলে গেল।

এ রকম ঝগড়া নূতন নয়। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী এতে অভ্যস্ত। মেয়েকে তিনি একটুও বুঝতে পারেন না। সে জন্যও তাঁর বিশেষ দুঃখ নেই। কেন না, মেয়ে বাপকে খুব ভালবাসে, বাপের কথায় ওঠে বসে। কিন্তু তাই বলে এত আদর দেওয়া কিছু নয়! কর্ত্তাকে একবার বকে দিতে হবে!

—পাঁচ—

পরদিন থেকে কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ হল। আটটা থেকে সাড়ে নটা পর্য্যন্ত বৈঠক চলে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক এক দিন বসেন। তিনি থাকলে ঐ দেড় ঘণ্টায় কাজ ঢের হয়। নইলে গানের চেয়ে গল্প বেশী জমে! ছাত্রীর ঝোঁক গল্পের দিকে। ললিতার গলা মিষ্টি নয়, এ কথা আগেই বলেছি। বৈরাগীর গাওয়া নকল করতে যায়, পারে না। খুব চটে যায়। বাপ উপস্থিত থাকলে দিলাসা দেন, "অত তাড়াতাড়ি করলে হয় কি, মা? আস্তে আস্তে হবে।" বাপ না থাকলে, ছাত্রী এই নিয়ে অনেক ঠোঁট ফোলায়, মান অভিমান করে। এক দিন চোখের জল পর্য্যন্ত ফেললে। বৈরাগীর মহাজন পদাবলী খুব পড়া ছিল, এক রকম কণ্ঠস্থই ছিল। কিন্তু সে এই নিতান্ত আধুনিক হৃদয়টীর রহস্য ভেদ করতে পারত না। "ছি, কেঁদো না, দিদিমণি," ব'লে ছাত্রীর পিঠে হাত দিতেই সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদতে আরম্ভ করলে। "দিদিমণি! কাঁদছ কেন? আমি তোমাকে আমার চেয়ে ভাল কীর্ত্তন গাইতে শেখাব, কেঁদো না লক্ষীটী," এই রকম কত কি বলে তাকে কোন রকমে শান্ত করলে।

বৈরাগী থাকত আধ কোশ দূরে নদীর ধারে এক কুড়ে ঘরে। ঘরটী সাহেব তুলে দিয়েছেন। রোজ কাঁচা সিধা যায় সাহেবের কুঠি থেকে। সাড়ে সাতটার সময় সাহেবের উড়ে সরদার নীলকমল স্বয়ং সিধা নিয়ে হাজির হয়। সে জগন্নাথের দেশের লোক, গলায় কণ্ঠী

পরে, গোসাঁইকে আপনজন বলে মনে করে। রোজ সিধা গোছগাছ করে রেখে বাবাজীর পায়ে একটী গড় করে, বাড়ী ফিরে যায়। কোন কোন দিন দুদণ্ড গল্প করেও যায়। সাহেব, মেম সাহেব, মিসি বাবা এদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে বাবাজীকে নানা উপদেশ দিয়ে যায়। নীলুই তাকে জানিয়েছে যে ললিতা সাহেবের একমাত্র সন্তান, অত্যন্ত আদুরে মেয়ে, জিদ একটা ধরলে কখন ছাড়ে না। রায়নগর থেকে এসে সে বাপকে বলেছিল, "বাবা, আমি যে গোসাঁইয়ের গান শুনে এলাম, তাঁকে তুমি যেখান থেকে পার আনাও। তাঁর কাছে নইলে আমি কীর্ত্তন শিখব না।"

বাপ উত্তর দিয়েছিলেন, "এত বড় হয়েছিস্, এখনও বায়না! কক্ষণও তাকে আনাব না।"

দেবারু ভোরবেলা উঠে গোবিন্দকে নিয়ে বসে। তার ঠাকুর পূজাও অদ্ভুত। শাঁখ নেই, ঘণ্টা নেই, তুলসী নেই, চন্দন নেই। মন্ত্রও, বোধ হয়, কিছু জানে না। কখনও ত শেখে নেই। দুই সম্বল তার, চোখের জল আর গান। গান নানা রসের, চোখের জলও নানা রকমের। "আর কত দিন, বঁধু, কত দিন!" গেয়েও কাঁদে। আবার দু হাত বাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, "এসেছ? তুমি এসেছ?" গেয়েও কাঁদে।

ললিতা যে দিন গান শিখতে শিখতে কান্নাকাটি করলে, তারপর দিন ভোরে দেবারু পূজায় বসেই হেসে উঠল। বললে, "আজ ক'দিন হতেই এই রকম দুষ্ট হাসি হাসছ। আমি ভাবি, কেন! এই আমার সেই পরীক্ষা! তা বেশ, ঠাকুর! পরীক্ষা কর। দেখি কে হারে!"

সে দিন গানের সময় সাহেব এলেন। দেবারু তাঁকে বললে, "বাবু, আমাকে দিন আষ্টেক দশের জন্য ছুটী দেন না।"

সাহেব উত্তর দিলেন "তা বেশ ত! পালিও না যেন।"

ললিতা সজোরে হেসে বললে, "পালাবেন কোথা, পুলিসের ভয় নেই!"

বাপ বেরিয়ে গেলে কিন্তু ললিতা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "কেন ছুটী চাই, বলুন ত! এখানে কি এতই তেতো লাগছে, সহ্য হচ্ছে না!"

"দিদিমণি, কি যে বল তার ঠিক নেই। তেতো লাগছে! কাকে? সত্যি কথা বলি শোন। তুমি ধরে এনেছ এক ভিখারী ভবঘুরে জাত-বৈরাগীকে। সে এক জায়গায় এত দিন কখনও থাকে নেই। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে যে! মাঝে মাঝে এক একবার ছেড়ে দিও। দু-দশটা গেরস্ত বাড়ীতে গান শুনিয়ে, ভিক্ষে মেগে আসবে।"

"অত কথার দরকার কি গোসাঁইজী? বাবা ছুটী দিয়েছেন, আপনি বেড়াতে যাবেন, বেশ ত! আমাদিকে ত আর আপনি বাঙ্গালীর মেয়ে মনে করেন না, আমাদের ভিক্ষে নিয়ে আপনার পেট ভরবে কেমন করে? বাপ রে! কি অসম্ভব দেমাক আপনাদের! তিন হপ্তা আমাদের মুখ দেখেই সংসার বিষ হয়ে উঠল!"

ললিতার চোখ ছলছল করছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। বেচারা গোবিন্দদাস হাঁ করে চেয়ে রইল। কি বলবে এ পাগলীকে? মিনিট দুই তিন এই রকম নিঃশব্দেই কাটল। তার পর ললিতা একটী নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোসাঁই দিন দশেক মনের সাধে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল।

"জয় রাধে গোবিন্দ," বলে দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে সে যে কি আনন্দ পায় তা আমাদের বোঝা কঠিন। আমাদের অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরলে যে আহ্লাদ হয়, এ কতকটা সেই রকম। পুরানো ঘাগী চোর যখন জেলে ফিরে যায়, তারও হয়ত এই একই রকম আনন্দ হয়। পথ যে দেবারুর ঘর বাড়ী!

এ দিকে ললিতার মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে রয়েছে। চাটারজী সাহেব কাছে ঘেঁসতে সাহস পান নেই। নইলে তাকে কাছে পেলে মনের ঝাল কতকটা তার উপর ঝাড়তে পারত। গরীবের ছেলে চাটারজী, বিলেতে পাস-টাস করে চাকরী পেয়েছে। তার বড় সাধ ম্যাজিষ্ট্রেট-নন্দিনীকে বিয়ে করবে। ললিতাকে সুখী করবার জন্য সে দু চোখ বুঝে সাহেবীয়ানার কঠোর সাধনা করছে। কিন্তু নসীব খারাপ তার! প্রণয়িনীর নাগাল কিছুতেই পায় না। ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতী তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আশাও দিয়াছেন যে তাকে জামাই পদে অভিষিক্ত করতে তাঁদের কোন আপত্তি হবে না, তবে, "You know that Girlie is a fair handful—ললিতাকে বাগান ত সোজা নয়!"

দেবারু আসার আগে ললিতা তার প্রণয়ীকে এতটা দুর-ছাই করত না। কখন কখন টেনিসে সাথী করে নিত। কোথাও বন-ভোজনে গেলে, কোট, ব্যাগ, ছাতা, তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিত। দু-চার বার তার মোটার বাইকের চৌকীটাতে বসে বেড়াতেও গেছল। কিন্তু কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ হয়ে অবধি আর তাকে মোটে আমল দেয় না। একদিন চাটারজী সাহেব বুক বেঁধে প্রণয়িনীর কাছে এসে বসল

ক্লাবে। প্রণয়িনী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললে, "আচ্ছা, এক এক জন লোকের গড়ন কি সুন্দর হয়! আপনার ফিগার এমন চোঙ্গার মত হল কেন? এত বেঁটেই বা আপনি হলেন কি করে?"

চাটারজী লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখ খোলবার জো নেই। তাহলেই আগুন লেগে যাবে। ললিতা আবার বললে, "আমার বৈরাগীকে সে দিন দেখলেন ত! সেই যখন নদীতে স্নান করছিলেন! কি বি-ইউ-টীফুল ফিগার, চমৎকার গড়ন! আমাদের বৈঠকখানায় যে আপলোদেবের মূর্ত্তি আছে, সেই রকম। ঠিক নয়?"

চাটারজী খুব বিনয় ক'রে বললে, "আর জন্মে কীর্ত্তনীয়া হব।" কিন্তু তাতেও পার পেলে না। ললিতা জবাব দিলে, "এই জন্মেই চেষ্টা দেখুন না। সাহেবী করার চেয়ে সোজাও বটে, মানাবেও ভাল।"

বেচারা একেবারে দমে গেল। নাঃ, আর তার কোন আশা নেই!

দু দিন বাদে গোসাঁই ফিরে এল। নীলু মিসিবাবাকে খবর দিলে। শুনেই ললিতা বাপকে বললে, "বাবা, একবার যাব গোসাঁইয়ের সঙ্গে দেখা করতে?"

বাপ বললেন, "No, No, Girlie! তা হতে পারে না। আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। নীলু, যা বাবাজীকে নিয়ে আয়।"

দেবারু এলে ললিতা দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড করলে। "এই যে, এসেছেন! বাঙ্গালীর বাড়ী ভিক্ষে মেগে খেয়ে দিব্যি মোটা-সোটাটী হয়েছেন ত! কিন্তু রোদে ঘুরে ঘুরে রঙ কি হয়েছে! মা গো!"

বাপও মেয়ের দেখাদেখি শেকহ্যাণ্ড করলেন, কিন্তু ইচ্ছাসুখে নয়। একে ত যার তার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও রকম সৌজন্য করা রীতি

বিরুদ্ধ। তার উপর বৈষ্ণব গোসাঁইয়ের কর-মর্দ্দন করা একটু অশোভনও মনে হল। বললেন, "সত্যি বাবাজী, কদিন খোলা হাওয়ায় ঘুরে তোমাকে বেশ সুস্থ সবল দেখাচ্ছে। রঙ তোমার sun-proof, এত রোদে ঘুরেও একটু নিরেস হয় নেই। ললিতা তোমাকে ঠাট্টা করছে। আচ্ছা গোসাঁই, তুমি কি আগে কসরৎ টসরৎ করতে? যা আমার হাত টিপে ধরেছিলে!"

ললিতা দেবারুর কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "এবার মশায়ের ডানা দুটি কুচ্ করে কেটে দিচ্ছি। উড়ে বেড়ান বন্ধ করছি।"

বাপকে বললে, "বাবা, আমার গান শিখতে বড় দেরী হচ্ছে। মোটে এগোতে পারছি না। তুমি বল ত কাল থেকে সকালে বিকেলে দুবার বসি। গোসাঁইজী রাজী আছেন।" দেবারু একটু হাসলে।

চক্রবর্ত্তী সাহেব বললেন, "আপনার অসুবিধা হবে না ত, বাবাজী? আমার আপত্তি নেই। কিন্তু Girlie, ক্লাবে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিবি! চাটারজীকে ত আর মোটে কাছে ভিড়তে দিস্ না!"

"Daddy dear, one thing at a time—হুড়োহুড়ি করলে কি চলে? এখন গান শিখছি, শিখি। চাটারজীর বিষয় পরে নিষ্পত্তি হবে। আচ্ছা বাবা, আমি তাকে আজ চা খেতে বলছি। তাহলেই সে আপাততঃ খুশী হয়ে যাবে।"

চাটারজীকে তখনই এই চিঠি লিখলে :—আশা করি আপনি এখনই তাড়াহুড়ো করে কীর্ত্তনীয়া হতে যাচ্ছেন না। আমার কথা শুনেই একটা দুঃসাহসিক কিছু করে বসবেন না। নিজে বেশ করে ভেবে দেখুন, ইঞ্জিনীয়ারী ভাল, না গোসাঁই গিন্নি ভাল।

আমার গোসাঁই এসেছেন। তাই মনটা আজ খুব খুশী আছে। আজ বিকেলে আমার সঙ্গে চা খেতে আসুন না! চায়ের পর দুজনে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

ইতি ললিতা চক্রবর্ত্তী।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী সে দিন কাছারী হতে ফিরতেই গিন্নী মহা আনন্দে তাঁকে বললেন, "ওগো! মেয়েটার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নেই। চাটারজীকে আজ চা খেতে বলেছে। দুজনে গোল-কামরায় বসে ছবি দেখছে, আর খুব হাসাহাসি করছে। চল, আমরা আজ বেরিয়ে যাই দুজনে; জজ সাহেবের বাড়ী যাওয়া যাক্। তারা অনেকবার বলেছে গিয়ে চা খেতে।"

সাহেব হেসে বললেন, "তা, চল না। কিন্তু কথাটা যত সোজা ভাবছ, তা নয় গিন্নী!"

কর্ত্তা গিন্নী বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় গিন্নী গোল কামরার দরজা গোড়া থেকে মেয়েকে বলে গেলেন, "আমরা সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব। তোরা দুজনে চা খেয়ে গল্প স্বল্প কর না এই খানেই। নাই বা আজ ক্লাবে গেলি!"

চাটারজী গিন্নীর প্রসন্ন মুখ, চোখে হাসি, দেখে মনে মনে ঠিক করে নিলে, "যা থাকে কপালে। আজ ললিতাকে একবার বলে দেখব।"

চা শেষ হলে ললিতা যখন বললে, "চলুন, মিষ্টার চাটারজী। দুজনে বেড়িয়ে আসা যাক্। আজ আপনার মোটরবাইকে চড়ব।" তখন বেচারা যেন হাতে স্বর্গ পেলে।

"যা থাকে নসীবে আজ একটা ইস্‌পার উস্‌পার হয়ে যাবে। বলব ললিতাকে—ডার্লিং, আমি তোমারই।"

ললিতা গোধূলি রঙ্গের এক সাড়ী প'রে এল। বললে, "চলুন নদীর ধারে। বেশ সুন্দর হাওয়া। সূর্য্য ডোবা, চাঁদ ওঠা, দুই দেখে বাড়ী ফেরা যাবে।"

নদীর ধারে দুজনে নেমে অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে। সূর্য্য ডুবল। চাঁদ উঠল। সে দিন ভরা চাঁদ। জোছনায় চারিদিক হাসছে। নদী থেকে মন্দ মন্দ হাওয়া বইছে। ললিতার কপালের কুচো কুচো চুলগুলো সেই হাওয়ায় দুলছে, নাচছে। লাল সাড়ীখানা জোছনায় কেমন সোনালী সোনালী দেখাচ্ছে।

চাটারজী বললে, "আচ্ছা মিস্ চক্রবর্ত্তী, চাঁদের আলোতে এমন একটা স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয় কেন? এই দেখুন না, যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, আপনি কত হাসছিলেন, কত গল্প করছিলেন। চাঁদ উঠতেই আস্তে আস্তে কেমন আনমনা নিঝুম হয়ে গেছেন।"

এমন সময় একটা পাখী ডেকে গেল, "বৌ কথা কও।" চাটারজীর সাহস একটু বেড়ে গেল। চুপি চুপি ডাকলে, "ললিতা!" কোন সাড়া নেই। আবার বললে, "ললিতা! আমার উপর কি তোমার দয়া হয় না এতটুকু!"

"কি ক'রে হবে? আপনি যে রকম বেরসিক লোক মিছেমিছি আমার স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিলেন। চাঁদের আলোর নেশাটা জমতে দিলেন না।"

চাটারজী বারোমাস রাস্তা মেরামৎ করে, ইমারৎ তৈরী করে।

পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। ভবিষ্যতে, আপনি আমার পরিচিত, আমি আপনার পরিচিত। এর চেয়ে বেশী নিকট সম্বন্ধ কোন দিন হবে না। বুঝেছেন ?"

চাটারজী ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে বুঝেছে। বেচারা অনেক আশা ক'রে আজ বেরিয়েছিল। সব ফুরিয়ে গেল! যত নষ্টের গোড়া ঐ হতভাগা বৈরাগীটা। ললিতাকে যেন জাদু করেছে। একদিন সাহস করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলতে হবে।

গাড়ীতে বসে ললিতা চেঁচিয়ে বললে, "চললাম গোসাঁইজী। কাল আটটার সময় দেখা হবে।"

চাটারজী সাহেব হাঁকলেন "গুড্ নাইট, বাবাজী।"

গাড়ীতে যেতে যেতে ললিতা ভাবতে লাগল, "এই দুটো মানুষের মধ্যে কি তুলনা হতে পারে! তুলনা! আমার গোবিন্দদাসের পাসে চাটারজী কি একটা মানুষ! যাক্, আশা করি হেস্ত-নেস্ত হয়ে গেল, আর একে নিয়ে আমাকে বিরক্ত হতে হবে না। আচ্ছা, আমি কি লোকটার মনে অনর্থক কষ্ট দিলাম ? তা, এমনই কি কষ্ট! আমার বিশ্বাস, ও নিজের চাকরী-বাকরীর সুবিধার জন্য আমাকে বিয়ে করতে চায়। সত্যি প্রেম কি আর ঐ রকম অপদার্থ লোকের মনে থাকতে পারে! তবু, কে জানে, আমার ব্যবহারটা বোধ হয় একটু রূঢ় হয়েছে।"

গাড়ী থেকে নামবার সময় ললিতা চাটারজীর সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড করে বললে, "Thank you for a very pleasant drive, Mr Chatterji আমার আজ মেজাজটা ভাল ছিল না। যদি কিছু রূঢ় কথা বলে থাকি, ত আপনি ক্ষমা করবেন। আপনিই আমাকে চটিয়ে দিলেন, নইলে

আমি ত ঠিক করে বেরিয়ে ছিলাম, যে খুব ধীরে সুস্থে আপনাকে আমার মনের কথা বলব।”

গোবিন্দদাসের কাছে ললিতার দুবেলা সঙ্গীত শিক্ষা চলল। খুব পরিশ্রম করছে ললিতা। ছাত্রীর আগ্রহ দেখে শিক্ষক বড় খুশী হয়েছেন। তার উপর, ছাত্রীর গলায় একটা মিষ্টতা দিন দিন আসছে, যা আগে ছিল না।

প্রায় মাস খানেক পরে একদিন চক্রবর্ত্তী সাহেব বসে বসে অনেক-ক্ষণ মেয়ের গান শুনলেন। শুনে বললেন, “বাঃ, বাঃ, Girlie! এত দিনে তোর গানের মাঝে একটা ভাব এসেছে! এই ত চাই! বাবাজী, কেমন করে এটা ঘটালেন এই অল্প দিনে?”

দেবারু বললে, “বাবু, দিদিমণির স্বভাবেই যে মিষ্টতা আছে! গানে ভাব না এসেই থাকতে পারে না।

সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, “সে আপনার কেরামৎ। আমরা ত এত দিন মিষ্টতার কোন আভাস পাই নেই। এক এক সময় যা বকুনি দেয় আমাকে, মশায়!”

বাপ জানেন না, দেবারুও হয় ত বোঝে না, যে এই ভাবের উৎপত্তি কোথায়। আড়ালে দাঁড়িয়ে যে অতনু ঠাকুরটী বাণ-সন্ধান করছিলেন তাঁকে এঁরা ত দেখতে পান নেই! ললিতাই কি নিজের দশা বুঝতে পেরেছে? সে বুঝতে চেষ্টাই করে না, বুঝবে কি! চব্বিশ ঘণ্টা যেন একটা নেশায় মশগুল হয়ে রয়েছে। কীর্ত্তন নিয়ে মেতেছে, কেন না গোবিন্দদাস সেই কীর্ত্তন শেখাচ্ছে। নইলে কীর্ত্তন ত আগেও গাইত। তখন তাতে ত কোন রস পায় নেই।

ক্লাবে ললিতা আর যায় না। সন্ধ্যাবেলা গানের পর এক এক দিন বাবাজীকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। যেতে যেতে তাঁর দেশের কথা, বাড়ীর কথা, কত কি জিজ্ঞাসা করে। একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল, "আচ্ছা গোসাঁইজী, আপনার সঙ্গে আমার রাণী মাসীমার এত আলাপ হল কি ক'রে? সে দিন আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর মাসীমা কত ক্ষণ কেঁদেছিলেন!"

একটু চুপ করে থেকে দেবারু খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, "রায়-নগর যে আমার মায়ের দেশ! রাণীমা তাঁকে ছেলেবেলায় বড্ড ভাল বাসতেন।"

আর একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনার চেহারা অনেকটা আমার মেসো মশায়ের মতন, তা জানেন ত?" দেবারু কোন উত্তর দিলে না। আকাশ পানে চেয়ে রইল।

গাড়ীতে দুজনের কথাবার্ত্তা বেশ সহজ ভাবে হত, কিন্তু শত চেষ্টাতেও ছাত্রী শিক্ষকের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠতা জমাতে পারত না। একদিন বললে "গোসাঁইজী, আমার অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ আছে। কুড়ি বছর বয়স হয়েছে আমার, অথচ মা বাবা জোর করে চাটারজীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। লোকটাকে আমি দেখতে পারি না।"

দেবারু একটু হেসে উত্তর দিলে, "কেন দিদিমণি, সাহেব ত খুব ভাল লোক। আপনাদের সঙ্গে বেশ বনবে।"

ললিতা রেগে আগুন হয়ে গেল। এই তুমি আমায় চিনেছ, গোবিন্দ-দাস! তুমি কি অন্ধ, একেবারে দেখতে পাও না! কার জন্য আমি

আমার সমাজ ছেড়েছি, এত দিনের অভ্যাস, বেশ ভূষা সব বদলে ফেলেছি।

সত্যি, কোথায় গেল ললিতার সেই সব রঙ্গ বেরঙ্গের ভয়েল, শিফঁ, জর্জেট, ক্রেপদেশিনের সাড়ী! কোথায় গেল তার নানা ঢপের বিলেতী ব্লাউস? কোথায় গেল উঁচু উঁচু খুরো দেওয়া নানা বর্ণের জুতো! সেই ললিতা এখন সাদা মিলের সাড়ী আর হাত কাটা পিরানের মতন জামা প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালী পা, বড় জোর বেরোবার সময় একটা যেমন তেমন চটী। এ সব কার মুখ চেয়ে করেছে সে! তবু বৈরাগী মনে করে, চাটারজীর সঙ্গে তার বনবে ভাল!

কয়েক দিন পরে গানের জলসা হয়ে গেলে গোসাঁই বললে, "দিদি-মণি, আমি আবার একবার ঘুরে আসি দিন কয়েক?"

ললিতা একটীও কথা কইলে না। গালে হাত দিয়ে বসে রইল গোসাঁইয়ের পানে তার বড় বড় চোখ দুটী মেলে। আস্তে আস্তে দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল তার গানের খাতার উপর।

দেবারু গম্ভীর ভাবে বললে, "ছি, ললিতা দিদি, এই তুমি না কুড়ি বছরের হয়েছ! ছোট্ট খুকীটীর মতন কাঁদছ!"

ললিতা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দাঁড়াল, "আপনার জন্য কাঁদি নেই গো, মশায়, কাঁদি নেই। চোখে একটা কি পোকা পড়েছিল। আপনি যান, দিন কয়েক গেরস্ত বাড়ী ভিক্ষা মেগে আসুন। নইলে খিদে মিটবে না," বলে বেরিয়ে গেল। গোবিন্দদাসও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরল।

তার আজ বড় রাগ হয়েছে। বাড়ী গিয়ে খাওয়া দাওয়া কিছু করলে

না। ঠাকুরকে নিয়ে চোখ বুজে বসল। একটু পরে বলতে লাগল, "গোবিন্দ! বন্ধ কর তোমার এ নিষ্ঠুর খেলা। আমাকে শাস্তি দিতে হয়, দাও। কিন্তু এ নিরপরাধী মেয়েটাকে কেন শাস্তি দেবে তুমি? এখনও ঐ দুষ্ট হাসি হাসছে! এও আমাকেই পরীক্ষা? বটে! আচ্ছা গোবিন্দ, তাই হোক। দেখি শেষ পর্য্যন্ত কে হারে, বন্ধু!"

—ছয়—

চাটারজী সেই নদীর ধারের ঘটনার পর কদিন কেমন মুষড়ে গেছল। আবার কোমর বেঁধেছে। ললিতাকে সে এত সহজে ছাড়বে না। তাকে পেলে, সুন্দরী লাভ ত হবেই। উপরন্তু, চক্রবর্ত্তীর মত একজন প্রবল পরাক্রান্ত মুরুব্বী লাভ হবে। শোনা যাচ্ছে যে তিনি আসছে বছর সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরী নিয়ে যাচ্ছেন। তা যদি হয়, ত সেই সঙ্গে তাঁর জামাইয়ের কত সুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু ঐ কাছা খোলা বৈরাগীটাকে না তাড়াতে পারলে ললিতার কাছে ঘেসা অসম্ভব। আর সত্যি বলতে কি, তাঁর বড় অপমান বোধ হচ্ছে। একটা ছোট লোক বৈরাগী এসে কি না তাকে হটিয়ে দিলে! সে একটা শিবপুরে পাস করা নেটিব ইঞ্জিনীয়ার নয়! সে কুপার্স হিল কলেজের ছেলে।

এই সব পাঁচ রকম ভেবে, একদিন ক্লাব থেকে ফেরবার পথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বললে, "স্যার, যে রকম দেখছি আমার আর ললিতার আশায় বসে থাকা বৃথা। সে ঐ গোসাঁইটাকে নিয়ে এমনই মেতেছে, যে শহরে কান পাতা যায় না। সন্ধ্যার পর দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যায় পর্য্যন্ত।"

চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার পর খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "দেখ চাটারজী, আমার মেয়ে কার সঙ্গে বেড়ায় না বেড়ায়, সে বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই দেখি না। ললিতা যদি

তোমাকে কোন দিন বিয়ে করে, তখন তার উপর হুকুম চালিও। সে তখন বুঝবে।"

চাটারজী খুব কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন "আমাকে আপনি মিছে মিছি ধমকাচ্ছেন, স্যার। আমি কারও নিন্দা করতে ইচ্ছা করি না। যা বলছি নিজের গরজে। আপনি যদি সে অধিকার না দেন, ত আমি কোন কথাই কইতে ইচ্ছা করি না।"

চক্রবর্ত্তী উত্তর দিলেন, "আচ্ছা চাটারজী, তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। গোসাঁই ছুটিতে যাচ্ছে। একদিন ললিতাকে বলব এখন।"

দেবারু যখন দিন দশেকের জন্য পালিয়ে গেল, ললিতার বড় কষ্ট হল। সে মার সঙ্গে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি করে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে। শুধু পায়ে মোটা কাপড় প'রে বেড়াতে লাগল। দেখুক ফিরে এসে, যে সেও বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ে, তাকে রোজ দেখতে হয় ব'লে হাঁপিয়ে ওঠবার কোনও কারণ নেই! একদিন হল কি, ডিনারের সময় ললিতা টেবিলে এল না, আয়া এসে খবর দিলে যে মিসি সাহেব শোবার ঘরে ভূঁইয়ে ব'সে খেয়ে নিয়েছেন।

চক্রবর্ত্তী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব হচ্ছে কি; তোমার কি মেয়ের উপর একটুও influence নেই?"

"নিজেই এই সব করেছ, এখন আমার influence এর কথা তুলে ফল কি? ও কি আমার কথা মানে? কিছু বলতে গেলে শাস্ত্র শোনাতে আসে। আজ সন্ধ্যাবেলা কত বক্তৃতা করলে যে ইংরেজী কায়দা করতে গিয়ে আমরা দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারিয়েছি। কালে কালে আরও কত শুনব।"

"আচ্ছা, আমি খাওয়ার পর কথা কইব ওর সঙ্গে।"

ডিনার হয়ে গেলে, ললিতা বারান্দায় বাপের কাছে এসে বসল। বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ Girlie, তুই কি আমাদের এক-ঘরে করবি ঠিক করেছিস্?"

"কেন, বাবা? তোমরাও কেন আমাদের দেশী রকমে থাক না।"

"Too late, Girlie—এই বয়সে পেরে উঠব না। রোজ রোজ ভাত, দাল, চড়চড়ি হজমও হবে না। আর, মেজের ধুলোর মাঝে খাবার রেখে খেতেও পারব না। তা, তোর এ রকম কত দিন চলবে?"

"আমি আর তোমাদের মিসি বাবার ভূমিকা নিতে রাজী নই।"

"তা নাই বা নিলি। মিসেস্ চাটারজীর পার্ট ত নিতে পারিস কাল থেকেই।"

"না, বাবা। তোমার মত একটা সত্যিকার বড় সাহেবের মেয়েই যদি থাকতে পারলাম না, ত ঐ রকম মেকী সাহেবের মেম হওয়া আমার পোষাবে না।"

"ললিতা, আজ আমাকে তুই চটাতে পারবি না। আমি খুব মেজাজ ঠাণ্ডা করে কথা কইব ঠিক করেছি। আচ্ছা, তুই করতে চাস্ কি?"

"সে ত সোজা কথা, বাবা! তুমি যা করতে লাগিয়ে দিয়েছ, তাই করতে চাই।"

"পেশাদার কীর্ত্তনীয়া হবি? ভদ্রলোকের মেয়ে ত তা হয় না।"

"আবার তোমার ঐ সব সেকেলে কথা! যা এত দিন হত না তা কখনও হবে না, আমাকে কি তুমি এই শিক্ষা দিয়েছ? বাবা, তুমি যাকে

এ সব কথা এখন কিছু বলতে যেও না। নিজে ভেবে দেখো। বুঝবে যে আমার এ অধিকার আছে, আমি বলতে পারি, যে আমি জীবনে অমুক পথে চলব।”

“আচ্ছা, মা। আজ আর কিছু বলব না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। কীর্ত্তনীয়া হলে বিয়ে থা করবি না?”

“এমন কি কথা আছে, বাবা? ইচ্ছা হলেই করব।”

“অল্ রাইট্, শুগে যা। আমি একটু চিন্তা করি।”

দেবারু ফিরে এসে যে ললিতার শুধু বেশ পরিবর্ত্তন দেখলে, তা নয়। গলা যেন আপনা থেকে আরও কত মিষ্টি হয়ে গেছে। চোখের ভাব যে কি সুন্দর হয়েছে, বলা যায় না।

দুই এক দিন পরে জিজ্ঞাসা করলে, “দিদিমণি, তোমার হয়েছে কি?”

“কি আবার নূতন হবে? বৈষ্ণবী তৈরী করতে পারলে ত আপনারই হাত-যশ।”

“বৈষ্ণবী হবে, দিদি? সাহেবের সঙ্গে ত সে রকম কোন কথা ছিল না।”

একটু হেসে ললিতা বললে, “বাবার সঙ্গে আমার অনেক ক[illegible] হয়ে গেছে গোসাঁইজী।”

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ললিতা হেঁটে বেড়াতে বের হচ্ছে, এমন সময় তার মা ডাকলেন, “ও ললিতা, কোথায় যাচ্ছিস্ এই অন্ধকারে? কি রকম কালো মেঘ করেছে, দেখছিস্ না? এখনই ঝড় উঠবে। এ দিকে আয়।”

মেয়ে কাছে গেল। মা দেখলেন মেয়ের কপালে চন্দনের টিপ, গলায় কণ্ঠী, হাতে এক গাছা বেলফুলের গড়ে মালা। চটে আগুন হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি ঢঙের অন্ত নেই! কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"গোসাঁইয়ের কাছে যাচ্ছি, মা। তার ঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আসি।"

"না, তোমার যাওয়া হবে না। কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই অন্ধকার রাত্রে একা বৈরাগীর কুড়েতে যাওয়া হচ্ছে! বিয়ে থা করতে হবে না কোন দিন?"

"অত কথা বলছ কেন, মা? বিয়ে দেবে? বর আমি ঠিক করেছি। আর তোমরা রাজী হলেই কি, না হলেই কি? আমার বরকে আমি বিয়ে করবই একদিন। এই বেলা কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়াই ভাল।"

মার মুখ দিয়ে কথা বের হল না। কোন রকমে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

"কে আমার বর, জিজ্ঞেস করছ মা? গোবিন্দদাস গোসাঁই। যার জোড়া মানুষ আমি চোখে কোন দিন দেখি নেই, মা। কোন দিন দেখার আশাও রাখি না। রূপে গুণে অনুপম। মনুষ্য জন্ম নিয়েও যিনি স্বর্গের দেবতা। যাঁর চরণের এক কণা ধুলো পেলেও আমার নারী জীবন সার্থক হবে। বিয়ে দেবে, মা?"

"ললিতা, এ কি বলছিস্ সব! মার সামনে বলতে লজ্জা করছে না? ও গো, একবার এদিকে এস, এস। তোমার মেয়ের গুণের কথা শুনে যাও।"

চক্রবর্ত্তী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে রে, ললিতা!"

ললিতা কিছু বলবার আগেই মা বললেন, "ভাল ক'রে শোন। এ ন্যাকরা করার সময় নয়। তোমার মেয়ে, এই অন্ধকার রাত্রে, এই কাল বৈশাখীর ঝড়ের মুখে, বৈরাগীর ঘরে যাচ্ছে। আমি মানা করলাম, তাই মুখের উপর আমাকে বললে যে আমরা মত দিই আর না দিই, ও বৈরাগীকে বিয়ে করবেই।"

"এ কথা ঠিক, ললিতা?"

"হ্যাঁ বাবা, ঠিক। আমি এ কথাও বলেছি, যে আমার বর স্বর্গের দেবতা, তার চরণের এক কণা ধুলো পেলে আমার নারী জন্ম সার্থক হবে।"

"তবে আমার কথাও শোন্, ললিতা। আমি তোকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আমাকে এসে বলবি যে তুই চাটারজীকে বিয়ে করতে রাজী। যদি না বলিস্, ত পরশু থেকে আমার বাড়ীতে তোর স্থান নেই।"

"আমার কাজ সোজা ক'রে দিলে, বাবা। মা, বাবা! আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে এখনই চললাম। আমার যিনি আরাধ্য দেবতা, তাঁর পায়ে ধরিগে। স্থান দেন ভালই, নইলে—" ব'লে ললিতা বেরিয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে ভীষণ ঝড় উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। কড় কড় ক'রে ঘন ঘন মেঘ ডাকছে, আর চোখ ঝলসে দিয়ে বিজলী চমকাচ্ছে। সেই দুর্য্যোগের মাঝে, ঘোর অন্ধকারে, হাতড়াতে হাতড়াতে, হোঁচট খেতে খেতে, ললিতা গিয়ে উপস্থিত হল বৈরাগীর দরজায়।